



ଓ଼େର ଗାନ୍ଧର ଏ ଅ଼଼କର୍ଣ

ଦି ବୁକ ଏମ୍ପେରିୟମ୍ ମିନିଟେଡ, କଲିକତା-୬

গৌরান্ধ্রপ্রসাদ বাসু সম্পাদিত



ওয়েব গার্ল
এককর্তা

দি বুক এম্পরিঅম লিমিটেড কলিকাতা

ভূতের গল্পের সংকলন
প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম সংস্করণ, ১৩৫৩

মূল্য আড়াই টাকা মাত্র

দি বুক এম্প্রাইজম লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ২২-১, কনওআলিস স্ট্রীট
দি প্রিন্টিং হাউসের পক্ষে মুদ্রাকর পুলিনবিহারী সায়ন্ত, ১০; আগার সাকুলার রোড, কলিকাতা

জৈশোক্যনাথ হতে শুরু ক'রে আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের সকল
বিশিষ্ট লেখকের লেখা ভূতের গল্প সংকলন ক'রে দিলাম এই গ্রন্থে।
রবীন্দ্রনাথের গল্প এই সংগ্রহে নেই। তার কারণ এ নয় যে রবীন্দ্রনাথ
ভূতের গল্প লেখেন নি। তার কারণ রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিখ্যাত রচনা
'সুধিত-পাষণ', 'কঙ্কাল', এই সংগ্রহের গণ্ডির বাইরে। বড় হয়ে
সেই সব গল্প তোমরা পড়বে।

'শ্রীকান্ত' হতে যে কাহিনীটি এই সংকলনে ছাপা হল সেই খণ্ড রচনাটুকুই
সম্ভবত সমগ্র শরৎ-সাহিত্যের মধ্যে অশরীরী বা ভৌতিক কাহিনী
রচনার একমাত্র উদাহরণ। তাই সুবহু উপন্যাস হতে শরৎচন্দ্রের ভাষা
অব্যাহত রেখে ছোট্ট এই কাহিনীটুকু ছেকে আলাদা ক'রে ভূতের
গল্পের সংকলনের পাঠকদের উপহার দিলাম।

প্রমথ চৌধুরীর 'যথ' গল্পটিও এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে অনেকটা ঐ
প্রণালীতে। লেখক সম্প্রতি লোকান্তরিত হয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের
তিনি একজন শক্তিমান পুরুষ। বাংলা গল্পের মুক্তিদাতা হিসাবে
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর স্থান। এই সূত্রে তাঁর পরলোকগত আত্মার
প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

গৌরানন্দ-প্রসাদ বসু •

ভূতের গল্প প'ড়ে যারা ভয় পায় এবং যারা
পায় না তাদের সবার জন্মে ।—যারা
ভূতের গল্প পড়েই না
তাদের জন্মে নয় ।

হরতনের গোলাম

—১—

তোমরা অনেক আশ্চর্য ঘটনা কানে শুনেছ, কিন্তু আমি চোখে দেখেছি এক অত্যাশ্চর্য অদ্ভুত ঘটনা। তখন আমার বয়স অল্প—বোধ হয় তেরো-চোদ্দ।

বৃন্দাবন, ডাক-নাম বিষ্ণু, ছিল আমার সব-চেয়ে ভালোবাসার বন্ধু। এক ক্লাসে পড়তুম, দিনরাত একসঙ্গে থাকতুম, সে ছাড়া আর কারো সঙ্গে খেলতে, কথা-কইতে আমার ভাল লাগতনা। আমাদের কাছেই ছিল তাদের বাড়ি।

তখন আমরা নতুন তাস খেলতে শিখেছি। বিষ্ণু সেবার একদিনের জন্ম মামার বাড়ি গিয়ে বিষ্ণু খেলা শিখে এসেছিল। এসেই সে আমায় ঐ খেলা শিখিয়ে দিলে। দু-জনেই নতুন খেলিয়ে, কিন্তু বিষ্ণু দু-চার বাজি খেলেই পাকা ওস্তাদ হয়ে উঠলো। আমি প্রায় প্রতি হাতেই তার কাছে হারতুম। কোথায়ই বা তাকে জিতেছি? স্কুলের লেখা-পড়ার প্রাইজে, খেলাধুলার প্রাইজে সে বরাবরই আমায় হারিয়ে এসেছে; এমন কি নিমন্ত্রণ খেতে বসেও কোনো দিন তাকে জিতে পারিনি; সে বরাবর আমার চেয়ে বেশি পেয়েছে। এক-এক সময় সন্দেহ হতো আমার মায়ের স্নেহটিও বুঝি সে আমার চেয়ে বেশি-ক'রে জিতে নিলে। কিন্তু এতে আমার দুঃখ ছিল না। কারণ তাকে যে আমি সত্যিই ভালোবাসতুম।

রোজ সন্ধ্যার পর স্কুলের পড়া শেষ ক'রে, খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে আমরা দুই বন্ধুতে আমাদের সদর-বাড়ির পশ্চিম কোণে ভাঙা নহবৎ-খানার নীচের অন্ধকার ঘরটায় লুকিয়ে বসে তাস খেলতুম। এই ঘরটার পুরাকালে কে থাকত জানিনা; এ বাড়ি যখন জম্জমাট ছিল, তখন হয় তো কর্তাদের সানাই-ওয়ালারা এইখানে বস-বাস করত। এখন এখানে দিনে-রাত্রে কারো পায়ের ধুলো পড়ে না—এক চুপি-চুপি আমাদের ছাড়া। এই ঘরটা আমাদের দুই-বন্ধুর ভারি মনের-মতো ঘর ছিল—এর মধ্যে বাড়ির ভিতরকার তাড়াছড়ো এসে পৌঁছতে পারতনা; আমরা দু-জনে পায়রার খোপের মতো একটুখানি জায়গায় বেশ নির্জনে নিশ্চিন্ত মুখামুগি বসে মনের সুখে অবিরাম গল্গল্ করতে পারতুম। আমাদের ছুটির দিনগুলো নির্বিঘ্নে নিবিড় আনন্দে কাটত—এই ঘরখানির কোলে মাথা রেখে শুয়ে। বিলু নিজের হাতে ঐ ঘরের একটি কোণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক'রে রাখত। এর কোনো আভরণ ছিলনা—এর সমস্ত অভাব ও দৈন্যকে আমরা আমাদের অন্তরের আনন্দ দিয়ে ঢেকে রেখেছিলুম। নইলে সেই ককাল-সার জীর্ণ অন্ধকার কোর্টারের মধ্যে আমাদের কচি দুটো প্রাণ কিছুতেই তিষ্ঠতে পারত না।

বিলু মামার বাড়ি থেকে এক-জোড়া তাস সংগ্রহ ক'রে এনেছিল বোধ হয় তার মামাদের আড্ডার পরিত্যক্ত তাস। তাস-জোড়াটা ছিল খুবই পুরানো—ভদ্রসমাজে নিতাস্তই অচল। সম্ভবত তাই এত সহজে সে-বেচারী ওস্তাদ খেলোয়াড়দের কড়া হাতের কঠিন চাপড় থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বিলুর ছোট্ট নরম হাত-খানিতে এসে পড়বার সৌভাগ্য পেয়েছিল। বেচারাকে যে অনেক দিন ধরে অনেক চড়-চাপড় সহ্যেতে হয়েছে সে তার চেহারা দেখলেই বোঝা যেত। কিন্তু

কোন গুরুতর অপরাধে তার কানগুলো যে এমন নির্দয়ভাবে কাটা গিয়েছিল এবং কেনই বা তার বুকের উপর আঁচড় টেনে-টেনে এমন ক্ষত-বিক্ষত করা হয়েছে তা আমরা বুঝতে পারতুম না। এ তার কোন পাপের শাস্তি?—কে জানে!

তার এই জীর্ণশীর্ণ চেহারা দেখে আমাদের কেমন মায়া করত; সেই জন্মে তার উপর জোরজবরদস্তি করতে পারতুম না। একে নিয়ে অতি সন্তর্পণে খেলতুম;—আস্বে-আস্বে তুলতুম, আস্বে-আস্বে ফেলতুম, ভাঁজাতুম খুব আলগা হাতে। খেলা শেষ হয়ে গেলে ধীরে-ধীরে গুছিয়ে একখানি রুমাল মুড়ে তুলে রাখতুম—অতি যত্নে। সত্যি বলছি এই তাসকে এত ভালোবাসতুম আমরা যে এর বদলে নতুন ঝকঝকে তাস কিনে আনতে আমাদের লোভটুকু পর্যন্ত হয়নি কোনো দিন। এই তাসের ছবি দেখে আমার মনে হতো—এরা যেন এক-কালে এই বাড়িরই মানুষ ছিল, এখন তাস হয়ে গেছে। তোমরা হেসো না: এর হরতনের গোলামটিকে আমার মনে হতো ঠিক যেন বুড়ো ঠাকুরদার দরওয়ান এ! এর ফোঁটা-ওয়াল তাসগুলোও যেন কেমন-এক-রকমের। এক-একদিন বিছুর সঙ্গে খেলতে-খেলতে প্রদীপের ঝাপ্ণা আলায় এর আটা-নওলা-দওলার রঙিন ফুটকিগুলোর দিকে চেয়ে-চেয়ে হঠাৎ আমার চোখ কেমন ঝাঁধিয়ে যেত—মনে হতো আমি যেন তাদের ঐ ফুটকিগুলোর ফাটলের মধ্যে দিয়ে কতদূর চলে গেছি—সে যেন কতকালের আগেকার কোনখানে!—যারা অনেক-কাল আগে এখানে ছিল যেন তাদের কাছে! সেখানে কি দেখতুম, কি শুনতুম মনে নেই কিন্তু সে-সব দেখে-শুনে কেমন তন্ময় হয়ে যেতুম। হঠাৎ বিছুর ডাকে আবার ফিরে আসতুম। সে ধমক দিয়ে বলতো—“কি বসে-বসে ভাবচিস?—খ্যালুনা!” আমি অমনি তাড়াতাড়ি

যা-হোক-একখানা তাস ফেলে দিয়ে খেলায় আবার মন দিতুম। কিন্তু বুকটা কেমন ছম্ছম করতে থাকতো। মনে হতো এ নিশ্চয় যাদু করা তাস!

বিষ্ণুকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলুম—“এই তাস নিয়ে তোব মামাব বাড়িতে কারা খেলতবে বিষ্ণু?” বিষ্ণু বলেছিল—“শুনেছি দাদামশাই খুব পাকা খেলিয়ে ছিলেন, কেউ না-কি তাঁকে তাস-খেলায় হাবাতে পারত না। লোকে হিংসে করে বলতো, সে তাঁর খেলার গুণ নয়, তাসের গুণ! তিনি তাস গুণ করতে জানতেন। বোধ হয় এ তারই আমলের তাস।” বিষ্ণুর দাদামশাইকে আমরা চোখে দেখিনি, তাব মামাদেবই দেখতুম খুব বুড়ে। উঃ, তাহলে না জানি তিনি কত বুড়ে। এ সেই আণ্ডিকালের-বড়-বুড়ার হাতেব গুণ-কবা তাস। এ তাস ছুঁত বুক ছম্ছম করতে, কিন্তু তব ভালোবাসতুম বিষ্ণুর-দেওয়া এই তাস জোড়াটাকে।

এই তাস নিয়ে বিষ্ণু গম্ভীর মুখে বোজ আমায় সঙ্গে খেলতো। তাকে খেলায় জিততে পারতুম না বোলে সে প্রায়ই হাসতে হাসতে বলতো—“জানিস মল্লি, এ আমাব দাদামশাইয়ের গুণ-কবা তাস। এ তাস হাতে থাকলে কেউ আমায় জিততে পারবে না,—তুইও না।”

আমাদের আড্ডা ঘরের দেয়ালে গোকর চোখের মত একটা স্ক্রু কুলুঙ্গিতে ছোট্ট একটি তেলের প্রদীপ জ্বলতো—আমাদের বসবার কোণটুকু আলো-কোরে, বাকি ঘরটা অন্ধকারেব আবছায়ায় পড়ে থাকতো—কালো চাদর মুড়ি দিয়ে। খেলা জমে উঠতো, সঙ্গে সঙ্গে রাতের অন্ধকারও জমে উঠতো। একে-একে বাড়িব প্রদীপ সব নিভে যেত, ঘরের পাশে স্ক্রু গলির পথটা ক্রমে নির্জন হয়ে আসতো। চৌধুরী-বাড়ির দোতলার জানলা থেকে যে এক-ফালি স্ক্রু আলো এসে অন্ধকার গলির উপর পড়তো, ক্রমে সেটুকুও অস্ত যেত, গলির ফাঁকটা

ভরাট হয়ে উঠতো—জমাট অন্ধকারে ! আর সেই কালো পাথরের মতো অন্ধকারের উপর দিয়ে মাঝে-মাঝে গুনতুম কে যেন পায়চারি করছে লাঠি-হাতে খড়ম-পায়ে—খট্-খটাস ! খট্-খটাস ! তার পরেই খুব দূর থেকে একটা খেঁকি কুকুর বুক-ফেটে কাংরে উঠতো—কেই-কেই ! আর অমনি ঝুলের ঝালর ও মাকড়সার ঝাল-দিয়ে-ঘেরা আমাদের ঠাকুরদার আমলের পুরানো ঠাকুরদালানের কাল্প্যাচা ও চামচিকে-বাহুড়গুলো অন্ধকারের মধ্যে কখনো হুস্-হুস্ কখনো হিস্-হিস্ শব্দে তাদের বাচ্ছাগুলোকে সাবধান কোরে দিত এবং মাঝে-মাঝে ফট্ফট্ কোরে হাততালির আওয়াজে কাকে যেন আমাদের ঘরের দিকে তাড়িয়ে দিত ! ঐ বৃষ্টি সে এলো ! এই ভাবতে ভাবতে আমার সর্বাঙ্গ অসাড় হয়ে আসত । হাতের তাস মাটিতে নামতো না ! বিস্ত্র ধমক দিয়ে বলতো—“কি করছিস্ ? খ্যাল্ না !” তার এই ধমকানিতে আমার চট্কা ভাঙতো । আর সঙ্গে-সঙ্গে চারিদিকের ঐ বিশ্রী শব্দগুলো ও যেন ভয়ে-ভয়ে চূপ কোরে যেত । তা যদি না হতো তাহলে বোধ হয় ঘর থেকে ছুটে আমি বাবার কাছে পালিয়ে যেতুম, কিছুতেই বিস্ত্রর সঙ্গে খেলতুম না ।

সেদিন খেলা আরম্ভ করতেই হঠাৎ খুব জোরে ঝড়-বৃষ্টি এলো। একটা ঝড়ের দম্ভকা আমাদের কোলের তাসগুলোকে উন্টে-পান্টে ভেঙে দিয়ে ঘর থেকে খানিকটা ঝুল ও ধুলো উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। বিষ্ণু বললে—“মল্লি, দরজা-জানলাগুলো বন্ধ ক’রে দে!” আমি উঠে জানলাগুলো বন্ধ করতে লাগলুম। পশ্চিমের জানলাটায় হাত দিতেই কে যেন সজোরে আমার হাতে একটা ঝাঁকানি দিয়ে সেকুছাও কোবে চলে গেল। আমি তাড়াতাড়ি হাতটা ঘরের ভিতর ঢুকিয়ে নিলুম— কিছু বুঝতে পারলুম না। বুকটা ধুকধুক করতে লাগলো।

খেলতে বসেই সে বাজি জিতলুম। আশ্চর্য কাণ্ড! যা কখনো হয় নি, তাই হলো। বিষ্ণুও অবাক। সে একটু বেশি-ক’রে মন দিয়ে খেলতে বসলো। কিন্তু পরের বাজিও জিততে পারলে না। আমার কেমন সন্দেহ হলো—এলেমেলো ঝড় এসে তাসের ষাটুটা উড়িয়ে নিয়ে গেল নাকি!

আমি ক্রমাগতই জিততে লাগলুম। কিন্তু আমার কেমন মনে হচ্ছিল এ জেতায় আমার কোন বাহাদুরি নেই, প্রতিবারেই এমন তাস আসছিল যে খেললেই পিঠ পাওয়া যায়; কে যেন ম্যাজিক ক’রে ভালো-ভালো তাস গুলো বেছে-বেছে আমার হাতে তুলে দিচ্ছে। বিষ্ণু বাব-বার হেরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠলো—“আজ আমার পডতা খারাপ পড়লো দেখছি!” তার এই দীর্ঘশ্বাসটি আমার বুক গিয়ে বাজলো! আমি চঞ্চল হয়ে উঠলুম। আমার মন কেঁদে বলতে লাগলো—“আমি জিত চাই না, বিষ্ণু জিতুক।” • আমি ফন্দি ক’রে বিষ্ণুকে জিতিয়ে

দেবার জন্তে হাঁকুপাকু করতে লাগলুম ; কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না । আজকের ঐ বড়ে কেমন যেন সব এলোমেলো হয়ে গেছে !

বিনু ফেললে হরতনের বিবি, তাকে সেই পিঠটা দেবার জন্ত আমি তাড়াতাড়ি খেললুম গোলাম, কিন্তু পিঠ তোলবার সময় দেখা গেল গোলামটা চেহারা বদলে সাহেব হয়ে গেছে । কাজেই পিঠটা আমাকেই নিতে হলো । পরের হাতে আমি খেললুম চিঁড়ের দশ ; আমি জানতুম বিনু এ দশ ফোটার লোভ কিছুতেই ছাড়তে পারবে না, সে নিশ্চয় গোলাম দিয়ে পিঠটা নেবে ; বিনু ফেললেও গোলাম, কিন্তু আমার দশ-খানা হঠাৎ দু ফোটা চুরি কোরে কেমন করে যে আটা হয়ে গেল আমি কিছুতেই বুঝতে পারলুম না । আমি অবাক ; বিনু বাজি হেরে গৌ-হয়ে বসে রইল ।

রাগ হলে বিনুর বড়-বড় চোখ-দুটো আরো বড় হয়ে উঠতে দেখেছি, কিন্তু আজ যেন অস্বাভাবিক রকম বড় হয়েছে বলে মনে হতে লাগলো । সে-বারের খেলাতে তার হাতের ফ্রাই ইস্কাবনের দশখানার উপর চিঁড়ের সাতা পাশিয়ে দিতে গিয়ে যখন সেটা রঙের সাতার তুরূপ হয়ে গেল, তখন তার সেই হঠাৎ-বড়-হয়ে-যাওয়া চোখ দুটো কেমন-এক-রকম-ভাবে বিস্ফারিত ক'রে সে আমার দিকে চাইলে যে সে-চাহনিত্তে আমার সর্বশরীর ঝিম্ঝিম্ ক'রে এলো ।

বিনুকে ভয়ে ভয়ে বললুম—“ভাই, আর খেলে কাজ নেই । চল্ যাই ।” বিনু সে কথা কানেই তুলে না ।

ক্রমে রাত গভীর হয়ে এলো । মনে হলো বাড়ির সবাই ঘুমিয়েছে ; আমাদের এ ঘরখানারও যেন ঘুম ধরেছে ;—এর দরজার-জানলা ইট কাঠ ঘুমে ঢুলছে । প্রদীপের আলোটা থেকে-থেকে কেবল হাই তুলছে । কড়িকাঠের খোপে-খোপে চড়াই-পাখীগুলো গল্প শেষ ক'রে শুয়ে

পড়েছে। চারিদিক নিস্তরক নিঝুম! হাতের তাশগুলোর দিকে চেয়ে দেখি সাহেব-বিবিদের চেহারা ঘুমে জড়িয়ে আসছে। ক্রমে মনে হলো সমস্ত পৃথিবীটাই যেন ঘুমের ঝোঁকে তুলছে—ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্!

হঠাৎ চট্কা ভাঙলো চৌধুরী-বাড়ির ঘড়ির শব্দে—টং! সেই শব্দ অন্ধকারের ঘুম ভাঙতে-ভাঙতে অনেক দূর চলে গেল।

ও কি? ও কিসের শব্দ? কড়িকাঠের কাছে ঐ কোণের গর্ত থেকে কে অমন বিলী সুরে নিশ্বাস টানছে হুউউউস্‌স্‌!—হুউউস্‌স্‌! আমি চমকে উঠে বিছুকে জিজ্ঞাসা করলুম—“ও কিসের শব্দ ভাই?”

বিছু কথা কইলেনা; শুধু তাস থেকে চোখ তুলে কড়িকাঠের দিকে চাইলে, আর আমার মনে হলো তার সেই ডাব্‌ডেবে চাহনিটা চোখ-থেকে ঠিকরে বেরিয়ে কড়িকাঠের অন্ধকার কোণে গিয়ে এঁটে রইল—জল্ জল্ করে চেয়ে আমার দিকে। বিছুকে আমি কান্নার সুরে বললুম—“ভাই, আমার বড় ঘুম পেয়েছে।”

বিছু বললে—“আচ্ছা, আর দু-হাত খেল।” আমি চমকে উঠলুম—তার গলা শুনে। কি গম্ভীর আওয়াজ! এ তো বিছুর গলা নয়। কে তার গলার ভিতর থেকে কথা কইলে?

কোনো রকমে এই দু-হাত খেলা এখন শেষ করতে পারলে বাঁচি! কোনো দিকে কান দেবার, কোনো দিকে চোখ দেবার আমার আর সাহস হচ্ছিল না। ইচ্ছা হচ্ছিল এই তাস দিয়ে চোখ-কান ঢেকে ফেলি। আমি খুব চোখের কাছে তাস এনে এক-মনে খেলতে লাগলুম।

সে-হাত বিছু খেলেছিল রঙের নওলা। আমার হাতে গোলাম ছিল, কিন্তু পিঠ নেবার ইচ্ছা ছিল না। কি-ক'রে লুকোলে বিছু সেটা ধরতে পারবে না ভাবছি, বিছু ব'লে উঠলো সেই রকম বিষম ভারি গলায় ঘর কাঁপিয়ে—“গোলামটা আছে তো।”

ভয় হলো ধরা পড়ে গেছি। বাঁ-হাতের তাসের সারি থেকে চট্-ক'রে হরতনের গোলামটা তুলে নিয়ে হরতনের নওলার উপর ফেলতে গিয়ে দেখি—সামনে নওলা নেই ; বিষ্ণুও নেই। আঁা !

বুকটা ধব্ধ ক'রে উঠলো।

এ-পাশ ও-পাশ চেয়ে দেখি শুধু বিষ্ণু নয়, একখানি তর্সি ও নেই।

বৌ করে মাথাটা ঘুরে গেল। চোখে অন্ধকার দেখলুম। গা-হাত-পা ঝিম্-ঝিম্ করতে লাগলো। ঘরের চার কোণ থেকে চারটে বিকট হাসি গিল্গিল্ শব্দে ছুটে বেরিয়ে গেল। আর উপরের নহবংখানা থেকে ঢাক ঢোল কাসি বাঁশি সব এক সঙ্গে বেজে উঠলো। আমি কাঁপতে-কাঁপতে মাটিতে শুয়ে পড়লুম। মনে হলো আমার হাত-পায়ের সমস্ত খিল যেন আল্গা হয়ে গেছে—উঠে-হেঁটে পালাবার আর উপায় নেই।

আমার কান্না আসতে লাগলো—বিষ্ণু—আমার বিষ্ণু কোথায় গেল ? উপর থেকে ভাঙা কাসিখানা ফাটা আওয়াজে বলতে লাগলো—কৈ না না ! কৈ না না ! আমি খুব চেষ্টা করে ডাকলুম—বিষ্ণু, বিষ্ণু ! কিন্তু আমার গলার স্বর মুখ দিয়ে না বেরিয়ে পেটের ভিতর চলে গেল—ঘুরতে-ঘুরতে, গৌ-গৌ-শব্দে !

একবার আশা হলো বিষ্ণু হয়তো বাইরে গেছে—এখন আসবে। কিন্তু বাঁ-হাত থেকে ডান হাতে তাসটা নিয়েছি মাত্র—এই এতটুকু সময়ের মধ্যে সে এতবড় ঘর পেরিয়ে বাইরে গেল কেমন করে ? হয়তো আমি অন্ধকারে দেখতে পাইনি। তাই হবে। এই মনে ক'রে দরজার দিকে এগিয়ে গেলুম, কিন্তু গিয়ে দেখি—একি যেমন খিল বন্ধ করেছিলুম, ঠিক তেমনই আছে। তবে সে কেমন ক'রে বাইরে গেল ?

হঠাৎ মনে হলো বিলু আমাকে ভয় দেখাবার জন্তে এই ঘরের মধ্যে লুকিয়ে নেই তো !

কিন্তু কোথায় লুকোবে ? ঘর যে ফাঁকা । আসবাবের মধ্যে মাত্র একটু ভাঙা আলমারি । তার পেছনে বড় জোর আঙ্গুল পাঁচেক জায়গা । তার মধ্যে ঐকটা মানুষ থাকতে পারেনা । তবু সেখানটা একবার দেখলুম । ঘরের একোণ ওকোণ এধার ওধার প্রদীপ ধ'রে দেখলুম ভন্ন ভন্ন ক'রে । কিন্তু সে কোথাও নেই—কোথাও নেই !

কতক্ষণ পড়ে-পড়ে কেঁদেছিলুম জানি-না। যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম, তখনও কান্নার জলে চোখ আমার ঝাপসা। রাত তখন নিশুতি। চারিদিক নিম্নম। কেউ কোথাও নেই; কেবল আমাদের তিন মহল প্রকাণ্ড বাড়িখানা দেখলুম ভয়ঙ্কর আতঙ্কে কাঠ-হয়ে দাঁড়িয়ে আছে; যেন তার সর্বাক্ষে কাটা দিয়ে উঠেছে! চৌধুরীদের চৌতলার চিলের ছাদটা আমাদের দিকে এতখানি গলা-বাড়িয়ে ভিজ্জাসা করলে—“কি হ’ল রে, কি হল? কোথায় গেল?” পশ্চিম-কোণের ঢাঙা সুপারিগাছটা কিছু না ব’লে শুধু ডিঙি-মেয়ে আকাশের দিকে মুখ-তুলে ইশারায় দেখিয়ে দিলে—আমাদের বাড়ির ঠিক মাথায় একটা মস্ত-বড় কালো পাখী তাসের মতো নানা রঙে চিত্র-বিচিত্র-করা ডানা মেলে মেঘের ধার দিয়ে অন্ধকারে ভেসে চলেছে—কাকে ঠোটে নিয়ে! তাই দেখে চারিদিক থেকে চাপা গলায় সবাই ব’লে উঠলো—“আ হা হা!” অমনি আমার বুকের ভিতরটা ক’রে উঠলো—“আহা! বিলুকে ওরা ভেল্কি-বাজিতে উড়িয়ে নিয়ে গেল!”

ভাবতে-ভাবতে আমার চোখের সামনে থেকে যেন সব একে-একে মুছে আসতে লাগলো, পায়ের তলা থেকে পৃথিবীটা ধীরে-ধীরে সরে যেতে লাগলো; আমি যেন একটা অতল অন্ধকারের মধ্যে ডুবতে লাগলুম—পলে-পলে, তালে-তালে!

তার পর মনে পড়ে অন্ধকারে চেনা-পথ ধরে বাড়ির ভিতরের দিকে যাচ্ছিলুম; হঠাৎ কানে এলো তাস পেটার শব্দ—চটাস্-চটাস্! এত রাত্রে এখানে অন্ধকারে, তাস খেলে কে? মুহূর্তের মধ্যে

আমার চলা বন্ধ হয়ে গেল, আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলুম।

বারান্দার পশ্চিম-কোণে ঘুরঘুরে অন্ধকারের মধ্যে আমাদের খাজনা-ঘর। দিনের বেলা এর সামনে দিয়ে যেতে আমাদের গা-ছম্ছম্ করে, সে জন্তু এ-দিকটো আমরা কেউ মাডাতুম না। আমাদের বিশ্বাস যত রাজ্যের ভূতপ্রেত ঐখানে বাসা বেঁধে মনের স্থখে ঘরকল্পা কবছে। আমরা ঐ মহলটা তাদের ছেড়ে দিয়েছিলুম। সেখানে কস্মিনকালে সকাল-সন্ধ্যায় আলো-গন্ধাজল পড়ত না,—বাঁটও কেউ দিত না। এই খাজনা-ঘর যে কতকালের তা কেউ জানে না,—বাড়ির মধ্যে সব-চেয়ে পুর্বানো এই জায়গাটা। শোনা যায়, ঠাকুরদাদাব যিনি ঠাকুরদাদা ছিলেন তাঁর আমলে জমিদারি খাজনা এলে এই ঘরে গচ্ছিত রাখা হতো—মাটির তলায় একটা চৌখুপিব মনো। সরু সুড়ঙ্গের মতো এই ঘর, সামনে মোটা মোটা লোহাব গবাদে-দেওয়া খাচার মতো দরজা—পিতলের শিকল দিয়ে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়ানো। সামনে দাঁড়ালে একটা সাঁতাংসাঁতে পচা গন্ধ নাকে আসে, আর চোখে পড়ে কালি-ঝুলি-মাখা একটা অন্ধকারের কুণ্ডলী—দিন-বাত ঘণির মতো ঘুবচে।

এই ঘর কতকাল যে খোলা হয়নি তার ঠিক নেই। খোলবার দরকারই হয়-নি। কারণ বহুদিন হলো আমাদের সে জমিদারী নেই, তাব খাজনাও আর আসে না। ঠাকুরমার মুখে গল্প শুনেছি, আমার ঠাকুরদাদাব যিনি ঠাকুরদাদা ছিলেন তাঁর অগাধ টাকা ছিল—একটা বাজা-বাজডার তেমন থাকে না। কিন্তু তিনি তারি রূপণ ছিলেন। একটি পয়সাও কাউকে প্রাণ থাকতে দিতে পারতেন না—এমন কি নিজের ছেলে-মেয়েকেও নয়। তিনি কেবল টাকার পর টাকার রাশ

জমা ক'রে চলতেন। লোকে টাকা খরচ ক'রে নাম কেনে, তিনি টাকা না খরচ করার বাহাদুরিতে লোকের কাছে খেতাব পেয়েছিলেন! টাকার উপর তাঁর এমন মায়া ছিল যে, পাছে মারা যাবার পর তাঁর টাকা খরচ হয়ে যায় এই ভয়ে তিনি তাঁর যথাসর্বস্ব যথের হাতে সমর্পণ ক'রে যান—যার কাছ থেকে একটি কাণ-কড়িও বার হবার যো নেই!

এই যথের কাহিনী একটা মস্ত-বড় গল্প! কেমন-কোরে একটি সুন্দর নয়বছরের ছেলেকে মেঠাই ও খেলনার লোভ দেখিয়ে তার বাপ-মায়ের কাছ থেকে চুরি ক'রে আনা হয়, কেমন ক'রে তাকে লাল চেলি পরিয়ে, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে, ঐ অন্ধকার খাজনা-ঘরের তলায় বন্ধ চৌখুপির মধ্যে—যেখানে কেবল ঘড়া-ঘড়া টাকা সাজানো আছে, আর-কিছু নেই, আর-কেউ নেই—না বাপ, না মা, না আলো, না বাতাস—সেইখানে একলাটি বসিয়ে রেখে, তার পর ঐ চৌখুপিতে ঢোকবার পথটা দশ-মণ পাথর দিয়ে চিরদিনের মতো বুদ্ধিয়ে দেওয়া হয়, সে কথা শুনতে-শুনতে আমার চোখে জল আসতো—বুক ছুর-ছুর করতো; আর ঠাকুরদাদার সেই পাষাণ ঠাকুরদার উপর রাগ হতো। ঠাকুরমা বলতেন—“আহা, ঐ সুন্দর নয় বছরের ছেলেটি কত কেঁদেছে, বাবা-বাবা-ক'রে বুক-ফেটে কত চেঁচিয়েছে তেঁটায় একফোঁটা জলের জন্ম ছটফট করেছে, তবু কেউ তাকে ঐ চৌখুপির দরজা খুলে দেয়নি।” শুনে আমার গলা কাঠ হয়ে আসতো। তার পর ক্ষিধে-তৃষ্ণায়-ভয়ে কাতরাতে-কাতারাতে বেচারা কখন যে হাঁফিয়ে মরে গেছে, সে হয়তো নিজেই বুঝতে পারেনি। এখন সে যথ হয়ে আছে—ঐখানে বসে-বসে কেবল টাকার ঘড়া আগলাচ্ছে। কারো সাধ্য নেই যে ঐ টাকা সেখান থেকে নিয়ে আসে! আমার

ঠাকুরদাদার বাবা না কি একবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বেশি দূর বেতে হয়নি; মেজের পাথরে একটি মাত্র সাবলের ঘা দিতেই তিনি গৌ-গৌ করতে-করতে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তিন দিন তাঁর কাপুন্নি ছিল; সাত দিন তাঁর মুখে রা ছিল না। কেন যে এমন হলো, কেউ জানেনা, তিনি নিজেরে কিছু বলেননি; কারো সাহসও হয়নি জিজ্ঞাসা করতে। সেই থেকে ঐ ঘরের দিকে আর কেউ যায় না।

মনে হলো ঐ খাজনা-ঘর থেকেই যেন তাস-খেলার শব্দ পেলুম। যদিও ওদিকে যেতে বুক দুর্দুর করতে লাগলো, কিন্তু বিম্বুর জন্তে না গিয়ে পারলুম না; যদি সে ওখানে থাকে—যদি সে আমায় দেখতে পেয়ে ছুটে আসে।

বুকটা দু-হাতে চেপে খাজনা-ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। লোহার গরাদে-দেওয়া দরজা দিনের বেলা শিকল-দিয়ে বাঁধা থাকে কিন্তু এখন দেখলুম খোলা। অন্ধকারে চোখে কিছু দেখা গেলনা, কিন্তু কানে শোনা গেল—কারা দুজন যেন দরজার দুইধার থেকে সেজোরে ছুটে এসে মাথায়-মাথায় অনবরত ঠোকা-ঠুকি করছে—দুম্, দুম্, দুম্, ! আমার কেমন মনে হলো যেন এইখানকার এই অগাধ সম্পত্তি এই যথের ধন—কে নেবে তাই নিয়ে দুই ভূতেই লড়াই চলেছে। আমি এক-মনে এদের লড়াইয়ের তাল গুনছি, হঠাৎ বিম্বুর মতো কার গলা পেলুম। সে বলছে—“বিবির চেয়ে রঙের গোলাম বড়।” আর-একজন কে সরু গলায় বলে উঠলো—“দূর বোকা, তা কখন হয়? গোলাম হলো সাহেব-বিবির চিরকালে কেনা গোলাম; হ'লই না-হয় সে রঙ মেখেছে!”

গোড়ায়-গোড়ায় আমিও একদিন বিম্বুকে বলেছিলুম—“গোলাম

কেন বিবির চেয়ে বড় হবে বিষ্ণু ?” বিষ্ণু বলেছিল—“এই-রকম যে নিয়ম।” আজও আবার সেই কথা উঠেছে। এও তাহলে আমাদের মতন নতুন খেলিয়ে দেখছি।

আবার শুনলুম—“তুই কিচ্ছুই খেলতে পারিস না! মল্লিকতার চেয়ে ঢের ভালো খেলে।” বিষ্ণু আমায় ডাকতো মল্লি কোঁলে।

মনে হলো, আমার যখন নাম করছে, এ তখন নিশ্চয় বিষ্ণু! বিষ্ণুর গলায় আমার নাম শুনে ঐ ঘরের মধ্যে ছুটে যাবার জন্যে আমার প্রাণটা আকুলি-ব্যাকুলি করতে লাগলো, কিন্তু পারলুম না; ভয় হলো, পাছে ঐ দুটো পাগলা ভূতের মাথা-ঠোকাঠুকির মধ্যে পড়ে খেঁৎলে যাই! আমি চূপ-ক’রে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলুম।

হঠাৎ অন্য লোকটা চোঁচিয়ে উঠলো—“অ্যা, হরতনের গোলাম কোথায় গেল? হরতনের গোলাম! ভারি আশ্চর্য!—এই ছিল, এই নেই! চোখের পাতা ফেলতে-না-ফেলতেই উড়ে গেল?”

আমার ভারি হাসি পেল—ঐ যাদু-করা তাস এদের সঙ্গেও যাদু খেলছে দেখছি!

বিষ্ণু বলে উঠলো—“হরতনের গোলাম?—সে তো মল্লির হাতে।” আমি নিজের হাতের দিকে চেয়ে দেখি—সত্যি তো, সেই হরতনের গোলাম, যা দিয়ে বিষ্ণুর নওলার পিঠ নিতে গিয়েছিলুম, সেখানা আমার হাতেই রয়েছে তো!

অন্য লোকটা বলে উঠলো—“কৈ হায়—মল্লিবাবুকে পাকাড় লে আও!”

সেই শুনে আমি তাড়াতাড়ি হরতনের গোলামখানা খাজনা-ঘরের ভিতর ছুঁড়ে দিয়ে এক-ছুটে নিজের শোবার-ঘরে পালিয়ে এলুম।

স্বরে' এসেও ভয়ে বুকটা ধব্ধ ধব্ধ করতে লাগলো—এই বুঝি সে এসে আমায় জাঁপটে ধরে নিয়ে যায়! আমি পা থেকে মাথা পর্যন্ত চাদর মুড়ি দিয়ে মড়ার মতো পড়ে রইলুম। খানিকক্ষণ কেউ এলোনা, তারপর কে একজন খসখস শব্দে বারান্দা দিয়ে চলে গেল—বোধ হয় আমার ঘর চিনতে পারলে না। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। নিশ্চিত হয়ে পাশ ফিরতে যাচ্ছি, এমন সময় কে আবার তড়াক-ক'রে লাফিয়ে আমার বিছানায় উঠলো—আমি ভয়ে কাঁঠ! যে এলো, সে খানিক বিছানার এদিক ওদিক ঘুরে-ঘুরে আমার গা শুঁকেশুঁক বেড়াতে লাগলো; তারপর আমার মাথার কাছে এসে মুখ-ঢাকা চাদরখানা ধরে সজোরে টানতে লাগলো—মুখ খুলে দেখবে। ওরে বাবारे! আমি প্রাণপণে চাদরখানা আঁকড়ে রইলুম, কিছুতেই মুখ খুলতে দিলুম না। তারপর সে পায়ের দিকে গেল। তার নিশ্বাসের হাওয়ায় আমার পা-ছানা ঠাণ্ডা হিম হয়ে এলো। আমার পা-ব'রে হিড়-হিড়-ক'রে টেনে নিয়ে যাবে না ত? ভয়ে পা গুটিয়ে নেবার চেষ্টা করলুম, না। খানিকক্ষণ সে চুপ ক'রে রইলো, বোধ হয় কি ভাবলে, তারপর আমার পাশে এসে ধূপ-কোরে শুয়ে পড়লো। সর্বনাশ! এখন করি কি! কিন্তু ঠিক সেই সময় আমার পুঁষি-বেড়ালটা ম্যাঁও-শব্দে ডেকে উঠতেই, সে তড়াক কোরে বিছানা থেকে লাফিয়ে পালিয়ে গেল।

পুঁষিকে কাছে পেয়ে আমার ভয় অনেক ভেঙ্গে গেল। তখন আবার বিমূৰ্ণ ভাবনা এলো—তা'হলে সত্যিই কি বিমূৰ্ণকে ওরা ঐখানেই—ঐ চৌখুপির মধ্যে নিয়ে গেল! সেখান থেকে সে পালিয়ে

আসবে কি কোরে? এই সব ভাবছি, হঠাৎ কে কানের কাছে মুখ এনে খুব চুপি-চুপি ডাকলে—“মল্লি, ভাই মল্লি! বিহুর কাছে যাবে? বিহুর কাছে!”

আমি ধড়মড়-কোরে উঠে বসলুম—বিহুর কাছে যাবার জন্তে বুকটা লাফিয়ে উঠলো, কিন্তু ভারি ভয় হতে লাগলো—“যদি আর ফিরে আসতে না পারি?”

সে তখন বললে—“ভয় কি! চল না! বিহু তোমার জন্তে বড় কাঁদছে।”

বিহুর কান্নার কথা শুনে আমার বুক ফেটে যেতে লাগলো। আমি ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলতে লাগলুম—“ওগো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, বিহুকে এবার ফিরিয়ে এনে দাও—বিহুর জন্তে আমার বড় মন-কেমন করছে।”

আমার কান্না শুনে সে চুপি-চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় দেখলুম, একটা মস্ত পাগড়িওয়ালা চেহারা—ঠিক যেন হরতনের গোলাম।

এই হরতনের গোলামটিকে তাসের মধ্যে সবচেয়ে আমি বেশি ভালোবাসতুম। আমাদের বাড়িতে যে বুড়ো খুরখুরে দরোয়ান ছিল—ঠাকুরদাদার আমলে, তাকে খুব ছেলেবেলায় দেখেছিলুম, অল্প-অল্প তার চেহারা মনে পড়ে; কিন্তু বেশ মনে আছে রোজ সকালে সে একটি কোরে রসমুণ্ডি আমায় খাওয়াত। কি মিষ্টি লাগতো সে রসমুণ্ডি! এখনো যেন তার স্বাদ মুখে লেগে আছে। আমার মনে হলো, এই হরতনের গোলাম যেন সেই বুড়ো দরোয়ান—এখন তাসের ছবি হয়ে গেছে। সে বোধ হয় আমার কান্না দেখে লাঠি-হাতে বিহুকে খুঁজে আনতে গেল। আবছায়ার মতো মনে পড়ে ছেলেবেলায় আমার

পুষ্টি-বেড়ালটা হারিয়ে যেতে, আমার কাঁধা দেখে, সে এমনি-ক'রে একদিন তাকে খুঁজে আনতে বেরিয়েছিল।

কতক্ষণ গেল ; ঘরের ঘড়িটা টক্ টক্ শব্দ করতে-করতে কতদূর চলে গেল, মনের মধ্যে কত ভাবনা এলো-গেল—তবু বিহু এলোনা। হায়, সে কি আর আসবে ? ঐ ভয়ঙ্কর চৌখুপি ঘর—যার সামনে দুটো ভীষণ ভূত মাথা ঠোকাঠুকি করছে অনবরত, সেখান থেকে বিহুকে কে উদ্ধার কোরে আনবে ? ভাবতে-ভাবতে আমার শরীর এলিয়ে আসতে লাগলো, চোখের পাতা জড়িয়ে আসতে লাগলো, কপালে যেন কে নরম ঠাণ্ডা হাত বুলিয়ে দিলে ; আর অমনি এক-নিমেষে মনে হলো, আমি যেন একখানা তাসের উপর শুয়ে কোথায় চলেছি—হাওয়ার সঙ্গে ভেসে-ভেসে !

তাসখানা ভাসতে-ভাসতে এসে আমায় একটা চারিদিক-আঁটা অঙ্ককার ঘরের মধ্যে নামিয়ে দিলে। দেখলুম সেই অঙ্ককারে বসে দুজন এক-মনে তাস খেলছে ; বিহু আর একটি ছোট ছেলে—সুন্দর দেখতে, থোকা থোকা কৌকড়া চুল চাঁদের মতো। কপালের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। ঠিক যেন বিহুর ছোট ভাইটি। বিহু তার সঙ্গে খেলতে লাগলো, আমার দিকে একবার চেয়েও দেখলে না। আমার ভারি রাগ হলো—হিংসেও হলো। এর মধ্যে এর সঙ্গে এত ভাব ! আমি মুখ গৌঁ-করে রইলুম।

ছেলেটি একেবারে তাস থেকে মুখ তুলে মিষ্টি স্বরে জিজ্ঞাসা করলে—“এ কে, বিহু ?”

বিহু গম্ভীর গলায় বললে—“ও মল্লি !”

সে বললে—“বেশ হলো ; আমরা তিনটি ভাইয়ে কেমন একসঙ্গে এইখানে থাকব !”

আমি রেগে চীৎকার কোরে উঠলুম—“না, না—আমি এখানে কিছুতেই থাকব না !”

অমনি হরতনের গোলাম এসে আমায় পিঠে-কোরে তুলে নিলে। বিছু সেটার উপর লাফিয়ে চড়তেই সেখানা ভারি হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। মজা দেখে ছেলেটা খিল-খিল-কোরে হেসে উঠলো।

বিছু বললে—“দাঁড়া, আমরা তিন জনেই এক-সঙ্গে ঝাব।”—বলে সে ছেলেটির কানে-কানে কি বললে। ছেলেটি বললে—“চল, যাই।” কিন্তু উঠে দাঁড়াতে গিয়েই ধূপ-ক’রে পড়ে গেল। দিন-রাত এক-জায়গায় বসে থেকে-থেকে তার পা অসাড় হয়ে গেছে। বিছু তাকে কোলে-কোরে তুলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। তাসগুলোকে কি বললে, তারা ফর-ফর ক’রে উড়ে এসে পাখীর মতো ডানা ছড়িয়ে দাঁড়ালো। আমরা উড়তে যাচ্ছি, এমন সময় কড়ি-কাঠ থেকে দুটো কালো চামচিকে এসে তাসগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তারপর দুই দল যা যুদ্ধ। আঁচড়া-আঁচড়ি, কামড়া-কামড়ি! আমি ভয়ে ঠকঠক-ক’রে কাঁপতে লাগলুম। চারিদিক থেকে অন্ধকারগুলো ছুটে এসে আমাদের সামনে তালগোল পাকিয়ে পথ-আটকে দাঁড়ালো!—যেন আমরা পালাতে না পারি! ছেলেটি কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে—“বিছু, দেখছিস তো, এরা আমায় যেতে দেবে না! তোরা কেন প্রাণে মরবি? পালা!”

বিছু বললে—“না ভাই, তোকে ছেড়ে কিছুতেই যাবনা।” চামচিকে দুটো তাই শুনে ফ্যাস্ ক’রে উঠলো। এমন সময় হরতনের গোলামটা ছুটে গিয়ে একটা চামচিকের পেটে সজোরে এক ঘুসি বসিয়ে দিলে; চামচিকেটা তার ধারালো নখ দিয়ে হরতনের গোলামখানাকে আঁকড়ে ধরে মাটিতে গড়িয়ে পড়লো, আর সেই ফাঁকে অগ্ন তাসগুলো আমাকে

নিয়ে উড়ে পালালো। বিহু আর সেই ছেলেটি দেখলুম সেই ঝাটাপটির মধ্যে হিম্‌সিম্‌ খাচ্ছে! আমি তাসের উপর থেকে হাত-বাড়িয়ে বিহুকে ডাকতে লাগলুম—“বিহু, আয় আয়!” বিহু আমার দিকে ফিরেই চাইলে না; ছেলেটাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইল। আমার কান্না পেতে লাগলো! তাসগুলো উড়তে-উড়তে এসে আমাকে বিছানায় ফেলেই উড়ে গেল— বোধ হয় বিহুদের উদ্ধার করতে। তার পর কি হলো জানি না!

“মল্লি ! মল্লি !”

আমি ধড়মড় ক’রে উঠে বসলুম ! ঝড়ের মতো ধাক্কা দিয়ে কে ঘরের মধ্যে ঢুকলো । সকালের আলোয় ঘরটা আলো হয়ে উঠলো । মনে হলো যেন একটা প্রকাণ্ড হুঃস্বপ্ন কেটে গেল । আমি ছুটে গিয়ে তুই-হাতে বিছুর গলা জড়িয়ে ধরলুম,—“বিছু, এসেছিস ভাই, এসেছিস ?”

সে বললে—“আসব না ত কি ! তুই স্টুপিড্ এত বেলা অবধি ঘুমচ্ছিস কেন ?”

আমি বললুম—“কখন এলি ভাই !”

সে বললে—“অনেকক্ষণ ! তোকে ডেকে-ডেকে আমার গলা চিরে গেল । তোর আজ হয়েছে কি ? চোখ অমন রাঙা কেন ?”

আমার ধাঁধা লাগলো । বিছু তো সবই জানে, তবে এমন আশ্চর্য হচ্ছে কেন ?

আমি আমতা-আমতা ক’রে বললুম—“কাল রাত্রে তুই খেলতে-খেলতে হঠাৎ অমন অস্তর্ধান—”

সে বাধা দিয়ে বললে—“আমি কেন অস্তর্ধান হতে যাব ? তুইতো খেলা ফেলে চোখ মুছতে-মুছতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলি ।”

আমার আরও ধাঁধা লাগলো । এ কি ঘুমের ঝাঁকে সবই স্বপ্নের মতো দেখলুম ! কিন্তু এত যে কাণ্ড, সে সবই স্বপ্ন ? ইচ্ছা হচ্ছিল আগাগোড়া সব কথা বিছুকে খুলে বলে হেঁয়ালিটা পরিষ্কার কোরে নিই, কিন্তু পারলুম না । দিনের আলোয় কথাগুলো এমন অদ্ভুত বোধ

হতে ভাগলো যে বলতে লজ্জা হলো। আমার ভূতের ভয়ের জন্তে বিহু বা আমায় ঠাট্টা করে!

বিহু বলে—“কি ভাবছিস? চল বাইরে যাই।”

আমরা চুই বন্ধুতে আমাদের সেই বাইরের ঘরে গিয়ে দেখি—ঘরময় তাস ছড়ানো; সমস্ত দেহ তাদের ক্ষত-বিক্ষত! তাদের বৃকের উপর যেন মনের আনন্দে ধারালো নখ দিয়ে কেবল আঁচড়ের-পর-আঁচড় টেনেছে। বেশ বোঝা গেল রাত্রের মধ্যে খুব একটা মারামারি কাণ্ড হয়ে গেছে। আমি সভয়ে বিহুর দিকে চেয়ে বল্লুম—“বিহু দেখছিস!”

বিহু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—“আমারই জন্তে তাসগুলো গেল!”

“আঁ! তোমারই জন্তে? তার মানে?—সেই চৌখুপি ঘর থেকে তোমাকে উদ্ধার করবার জন্তে? তা হলে তো সবই ঠিক!”

কিন্তু বিহুর মুখ-দেখে কিছু বুঝতে পারলুম না। একটু ইশারা পাবার আশায় আমি বিহুকে আবার জিজ্ঞাসা করলুম—“কি ক’রে এমন হলো বিহু!” বিহু কোনো জবাব দিল না, শুধু আঙুল দিয়ে ভান্ধা আলমারিটা দেখিয়ে দিলে।

আমি আলমারি খুলতেই একরাশ আরসোলা ফরফর-ক’রে ঘরময় ছড়িয়ে পড়লো। তারপর ডানা-মেলে উড়ে অন্ধকার কোণের একটা গর্ত দিয়ে কোথায় চলে গেল—বোধ হয় মাটির তলা দিয়ে সেই চৌখুপির মধ্যে। আমি হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইলুম।

বিহু বলে—“তাসগুলো কুড়ো!”

আমি তাসগুলো কুড়িয়ে, গুছিয়ে দেখি সবই আছে, কেবল একখানা নেই—সেই হরতনের গোলাম!

তবে?

এই জে ঠিক মিলছে! সেই হরতনের গোলাম—যাকে নিয়ে কাল

রাত্রে ঐ সমস্ত অদ্ভুত ঘটনার উৎপত্তি—সে নেই কেন। সে গেল কোথা ?

সে কোথায় আছে, আমি জানি। সে আছে সেইখানে—সেই চারিদিক-বন্ধু চৌখুপির মধ্যে, যেখানে সেই নয়-বছরের সুন্দর স্ত্রীলোকটি চিরদিন একা অন্ধকারে বসে আছে।

কালকের সব কাণ্ড বিহু নিশ্চয় ভুলে গেছে, সকালে ঘুম থেকে উঠে তার আব কিছুই মনে নেই। তার যে ঘুম। এমন তো আমারও এক-একদিন হয়। বাতের ঘটনা স্বপ্ন-দেখার মতো সকালে সব ভুলে যাই। কাল বাত্রে আমি যদি ঘুমিয়ে পড়তুম, তা' হলে আমিও হয়ত সব ভুলে যেতুম, আজ সকালে উঠে অবাক হয়ে ভাবতুম—তাই তো হরতনের গোলাম-বেচারী গেল কোথায় ?

এক-রাতের ইতিহাস

গাঁয়ের রঘু চাটুয্যে বেঁচে থেকে সবাইকে যেমন জালিয়ে ছিল, মরেও আমাদের ক'জনকে তেমনি জালিয়ে গেল। তার মরা উচিত ফাঁসিকাঠে, কিন্তু সে মরল বিছানায় শুয়ে।

আজ ক'দিন ধ'রে বিষম বাদলা নেমেছে, মেঘের আড়ালে ডুব মেরে স্থম্বিঠাকুর দিব্যি ঘুম দিচ্ছেন। থেকে থেকে বাজের গুড়গুড় নি,— তবে তা স্থম্বিঠাকুরের নাক-ডাকার আওয়াজ বোধ করি নয়। দিন রাত বৃষ্টির কামাই নেই—কখনও মুঘলধারে, কখনও টিপ্ টিপ্ ক'রে।

দিনেই চারিদিক ঘুটঘুট করছে, রাতের তো কথাই নেই। এই ভিজ্জ অন্ধকার রাতে দুর্দান্ত রঘু চাটুয্যে হঠাৎ পটল তুলে বসল।

রঘুকে সবাই ভয় আর ঘেমা করত। তার উপরে এই দুর্যোগ; আর শ্মশান হচ্ছে গাঁ থেকে চার মাইল দূরে। কাজেই মড়া পোড়াতে যেতে কেউই রাজি হ'তে চাইলে না।

নরকে নিয়ে ষাবার সময়ে ষমদুতেরা যদি রঘুর দেহটাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে নরকের অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দিত, আমরা তাহ'লে হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচতুম। কিন্তু তা যখন হ'ল না, তখন কি আর করি, রঘুর বুড়ী মায়ের কান্নাকাটি শুনে আমরা চারজনেই মড়া নিয়ে শ্মশানে যেতে রাজি হলাম।

টিপ্ টিপ্ ক'রে ইলসেগুঁড়ি ঝরছে আর ঝরছেই, পথে প্যাচ্-

প্যাচ্ করছে কাদা আর চারিদিকে থম্-থম্ করছে মিশ্ মিশে কালো রাত। একটা ভারি মড়া কাঁধে করে আমাদের চারজনকে। এই চার মাইল দুর্গম বনপথ পার হ'তে যে প্রাণান্ত-পরিশ্রম করতে হবে, সে-বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ নেই।

বাড়ির বাইরে পা দিতে-না-দিতেই মাথার উপরকার বটগাছের ডাল থেকে চ্যা-চ্যা ক'রে একটা প্যাচা চৌঁচিয়ে উঠল।

সেই অলক্ষণে ডাক শুনে মধু খুড়ো 'হরিবোল, হরিবোল' বলে প্রাণপণে চীৎকার করতে লাগলেন।

মাধব বললে, "ঘোঁষা আমাদের সহজে নিকৃতি দেবে বলে মনে হচ্ছে না। আজকের রাতটা ভালোয়-ভালোয় কাটলে বাঁচি।"

মানিক অক্ষুট কর্তে বললে, "রাম, রাম!"

আমি মুখে আর কিছু বললুম না।

রঘুর চাকর খ্যাঁদা লঠন নিয়ে আগে আগে চলল, তার পিছনে পিছনে পিছল পথে খুব সাবধানে মড়ার খাট কাঁধে করে আমরা অগ্রসর হলুম। এই খ্যাঁদা শুধু রঘুর চাকর নয়, সে ছিল তার সকল পাপ-কাজের সঙ্গী। তার চেহারা যেমন দুঃমন, তার স্বভাবও তেমনি কুৎসিত। তার ঐ দুখানা কালো কালো হাত যে কত ডাকাতি, রাহাজানি আর চুরি-জোচ্চুরি করেছে, সে আর হিসেব ক'রে বলা যায় না। রঘু ছাড়া আর কেউ তাকে ভালোবাসত না।

গাঁ ছেড়ে মাঠে, তারপর বনের ভিতর দিয়ে পথ, তারপর আবার মাঠ, তারপর নদীর ধারে শ্মশান। কিন্তু আজকের ঘুট্ঘুটে অন্ধকারে মাঠ আর বন, আকাশ আর পৃথিবী সব একসা হয়ে গেছে। তাদের অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছিল শুধু মাঝে মাঝে জ্বলে-ওঠা বিদ্যুতের আলোয়।

খ্যাদার লঠনের আলো মিট-মিট ক'রে জ'লে অন্ধকারের নিবিড়তাকেই যেন আরো ভালো ক'রে দেখিয়ে দিচ্ছিল।

মাঠ দিয়ে খানিক এগুবার পরেই পিছন থেকে মধু খুড়ো হঠাৎ ব'লে উঠলেন, “আমার মনে হচ্ছে, আমাদের পেছনে পেছনে কে যেন আসচে।”

খ্যাদা লঠনটা মাথার উপরে তুলে সেই স্বান আলোর সাহায্যে পিছন-দিকটা দেখবার চেষ্টা ক'রে বললে, “কৈ, কেউ তো নেই কর্তা!”

আমি বললুম, “খুড়ো, এই দুর্ঘোণে আর অন্ধকারে কে আর সখ ক'রে মাঠের মধ্যখানে ভিজতে আর হোঁচট খেতে আসবে?”

মাধব বললে, “কারুকে আর ভূতে পায় নি তো!”

মানিক শুকনো গলায় বললে, “আঃ, আবার ও নাম কেন? রাম, রাম!”

মাঠ ছেড়ে বনে এসে পড়লুম। চলতে চলতে মনে হ'তে লাগল, বনের গাছপালার সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়ায় অন্ধকারও যেন দোল খাচ্ছে! চলতে চলতে আমাদের সকলেরই গা ছম্ ছম্ করতে লাগল।

মধু খুড়ো ফের বললেন, “নিশ্চয় কেউ আমাদের পিছু পিছু আসচে! এবারে আমি খুব কাছেই পায়ের শব্দ পেলুম!”

খ্যাদা আবার পিছন-দিকটা দেখে ঘাড় নেড়ে বললে, “কেউ নেই কর্তা!”

আমি বললুম, “ভুল শুনেচ খুড়ো!”

মাধব বললে, “ভুল না হ'তেও পারে। শুনেচি এই বনে ব্রহ্মদৈত্যের বাসা আছে!”

মানিক মূঢ় স্বরে বললে, “রাম, রাম!”

বনের মাঝখানে এসে কাঁধ থেকে খাট নামিয়ে আমরা একটু জিরতে লাগলুম। হঠাৎ একদল শেয়াল কোথা থেকে এক সঙ্গে চোঁচিয়ে উঠল। আমরা ক'জন ছাড়া পৃথিবীতে যে আরো প্রাণী আছে, এতক্ষণ পরে তার সাড়া পাওয়া গেল। কিন্তু তারপরেই শুনতে পেলুম সেই অসময়ে বনের ভিতরে হেঁড়ে-গলায় কে গান গাইছে :—

“খাটে শুয়ে কে যায় রে, কে যায় রে,
কে যায় রে ওই !

পায়ে হেঁটে চ'লে আয়, ব'সে ব'সে
দুটো কথা কই !

বন ডাকে সোঁ সোঁ ক'রে,
মন গেছে আঁধি ভ'রে,
দুধু-ভাতি খাবি যদি কাছে আয়,
বলি পই-পই !”

—গানের আওয়াজ ক্রমেই আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে !
আমরা সবাই ভয়ে হরিবোল দিয়ে উঠলুম, মানিক শুধু “রাম রাম”
ব'লে চ্যাঁচাতে লাগল !

গান চলল :—

“পচা মড়া ভালো নয়,
পোকা কার পেটে সয় ?
বুড়ো-হাড়ে ন'ড়ে-চ'ড়ে যেতে প'ড়ে
আমি রাজি নই !

ডালে উঠে রাত-দিন
নাচি আয় ধিন্-ধিন্

আর খালি গীত গাই,—নিয়ে আয়

গাছে-চড়া মই !

ব্যাঙাচীরা ডাকবে না,

ফিঙে জেগে থাকবে না,

এত রেংদে ঘুরে ঘুরে হোস্ কেন

জলে-ভেজা খই !

ও যাম্দো ! ওরে পেঁচো !

কেন মিছে খাস কেঁচো ?

আকাশকে দে মাড়িয়ে পা বাড়িয়ে,

কর-হই-চই !

খাবি খায় টিকটিকি,

ইঁচি আসে ছাখ্ দিকি !

ইঁস-ফঁস্ গরা ইঁস, কোথা যাস্—

চই-চই-চই !

ঠ্যাং চলে শুয়ে শুয়ে,

কার পোলা পেলে পুঁয়ে ?

পাতে মোর কাঁচা মাথা দিবি নাকি ?

বেশ, তাই মই !

খাটে শুয়ে কে যায় রে, কে যায় রে,

কে যায় রে ওই !”

—একি অদ্ভুত গান ! এ কি ভয়ানক সুর ! তাড়াতাড়ি মড়ার
খাট নিয়ে শ্মশানের দিকে ছুটে চললুম !

শ্মশানে এসে খাট নামিয়ে আগে খুব-খানিকটা ইঁপিয়ে
নিলুম ।

তারপর মাধব বললে, “বনের ভেতর যে গান গাইছিল সে মাধব নয়।”

মধু-খুড়ো বললেন, “নরক থেকে রঘুর স্মৃতিগাতরা বোধ হয় তাকে আগুবাড়িয়ে নিয়ে যেতে এসেছে!”

রঘুর চাকর খ্যাদা রেগে খুড়োর দিকে কটমট ক’রে তাকিয়ে রইল।

মাণিক এত ভয় পেয়েছিল যে, কথা চুলোয় যাক তার মুখ দিয়ে আর “রাম রাম” শব্দ পর্যন্ত বেরুল না?

আমি বললুম, “ও-সব বাজে কথা থো কর। এখন জঙ্গলে গিয়ে আবার কাঠ কেটে আনতে হবে।”

মধু-খুড়ো বললেন, “অদৃষ্টে আজ অনেক কষ্টই আছে। এই ক’দিনের বর্ষায় ভেজা কাঠ দিয়ে কি ক’রে যে চুলি জালব, তা জানি না।”

আমি বললুম, “তবু চেষ্টা তো করতে হবে! নাও, উঠে পড়!”

মাণিক বললে, “আমি আর কোথাও যাচ্ছি না!”

—“তবে তুমি এখানেই থাকো।”

—“একলা?”

—“কাজে-কাজেই!

—“ওরে বাপ্‌রে! একলা বসে আবার যদি সেই গান শুনতে পাই, তা’হলে আমি আর বাঁচব না।……খ্যাদা আমার সঙ্গে থাক।

অগত্যা সেই ব্যবস্থাই করতে হ’ল। আমি, মধু-খুড়ো আর মাধব লঠন আর কুড়ুল নিয়ে জঙ্গলের ভিতরে কাঠ কাটতে চললুম।

অন্ধকারের সঙ্গে কোলাকুলি ক’রে আকাশ তখনো ক্রমাগত জল ঢেলে যাচ্ছিল। আমাদের ডানদিকে অদৃশ্য নদী বয়ে যাচ্ছে,—তার

জলকল্লোল শোনাচ্ছে ঠিক যেন ডাইনির কান্নার মতন। বাঁ-দিকে এক-মাঠ ভরা অন্ধকারের ভিতর থেকে বাতাসের হাহাকার শোনাচ্ছে, যেন কোন মরো-মরো রোগীর আত্ননাদের মতন। পিছনে শ্মশান— তার বুকে চেপে বসে কাল-রাত্রির স্তব্ধতাও যেন আজ ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠছে।

আচম্বিতে একদল শেয়ালও আবার চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল,— সঙ্গে সঙ্গে দেখলুম, একটা মানুষের মূর্তি মাঠের অন্ধকার ভেদ ক'রে একেবারে আমাদের সামনে আবির্ভূত হ'ল। বেজায় ঢ্যাঙা আর লিকলিকে সরু তার দেহ। একরাশ পাকা গৌফ-দাড়ী আর তিন-চার হাত লম্বা জটায় ঘেরা মুখের ভিতরে খুব বড় বড় ড্যাব্‌ডেবে চোখদুটো যেন দপ্‌দপিয়ে জ্বলে জ্বলে উঠছে!

লোকটা আমাদের দিকে ফিরেও তাকালে না, হন্ হন্ করে শ্মশানের দিকে এগিয়ে আবার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

আমি চুপি চুপি বললুম, “পাগল!”

ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে মাধব বললে, “ভূত! ভূত! ব্রহ্মদৈত্য!”

মধু খুড়ো সভয়ে বললে, “চুপ, চুপ! ঐ শোনো!”

আবার সেই গান!—

“ঠ্যাং চলে শুয়ে শুয়ে,

কার পোলা পেলো পুঁয়ে?

পাতে মোর কাঁচা মাথা দিবি নাকি?

বেশ, তাই সই!”

প্রত্যেকে এক এক বোঝা কাঁচ ঘাড়ে ক'রে আবার শ্মশানের দিকে ফিরলুম।

মধু খুড়ো বললেন, “শ্মশানের দিকে যেতে আর পা উঠচে না। যদি ফের সেই মূর্তির সঙ্গে দেখা হয় ?

মাধব বললে, “কাজ নেই আর শ্মশানে গিয়ে। চল আমরা এইখান থেকেই পালাই চল !”

আমি বললুম, “তাও কি হয় ? শ্মশানে আমাদের লোকেরা যে ব’সে আছে !”

মধু খুড়ো হতাশ ভাবে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন, “শ্মশানে তারা কি আর এতক্ষণ আছে ? গিয়ে দেখবে, তারা কোন্ কালে লম্বা দিয়েচে, আর সেই মূর্তিটা দিব্যি আরামে ছু পা ছড়িয়ে ব’সে রঘুর মড়া চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে !”

আমি বিরক্ত কণ্ঠে বললুম, “পাগলের মতন যা তা বোকোনা খুড়ো !”

হঠাৎ আবার গান শোনা গেল :—

“ডালে উঠে রাত-দিন

নাচি আয় ধিন্-ধিন্

আর খালি গীত গাই,—নিয়ে আয়

গাছে-চড়া মই !”

আমরা ভয়ে কাঁঠ হুয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম !

শ্মশানের দিক থেকে আসছে—এবারে আর একটা নয়, দু-দুটো মূর্তি !

প্রথম মূর্তিটার মুখের পানে তাকিয়েই আমার বুকের কাছটা যেন হিম হয়ে গেল ! এ যে রঘু চাটুষ্যে,—যার মড়া আমরা কাঁধে ক’রে শ্মশানে বয়ে এনেছি !—হাঁ, রঘু—রঘু—এ রঘু ছাড়া আর কেউ নয় !

—আর রঘুর পিছনে পিছনে চলেছে পোষা কুকুরের মতন, তার চাকর খ্যাদা ! দেখতে দেখতে অন্ধকারের ভিতরে তারা অদৃশ্য হয়ে গেল !

ছুটতে ছুটতে তিনজনে আবার শ্মশানে এসে পড়লুম। দেখলুম, মড়ার খাটের পাশে বসে একলা মানিক বলির পাঠার মত কেঁপে কেঁপে মরছে !

মধু-খুড়া তাড়াতাড়ি সুধোলেন, “মানিক, মানিক ব্যাপার কি ?”

আধ-মরার মতন ধুকতে ধুকতে মানিক বললে, “কিছু জানি না খুড়া, আমি আর এখানে থাকব না ! আবার সেই গান শুনে আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলুম। জ্ঞান হয়ে দেখি, আমাকে এখানে একলা ফেলে খ্যাদা-রাস্কেল লম্বা দিয়েচে !

খাটের উপরে কাপড়ে ঢাকা মড়া তো ঠিকই রয়েছে ! তবে কি আমরা যা দেখেছি তা চোখের ভুল।

মধু-খুড়া এক টানে মড়ার কাপড়খানা সরিয়ে দিলেন। সবিস্ময়ে দেখলুম, খাটের উপরে মড়া আছে বটে; কিন্তু তা রঘু চাটুজের নয় !— এই খানিক আগে মাঠের ভিতর যে জটা-দাড়ীওয়ালা, রোগা ও ঢ্যাঙা মূর্তিটাকে দেখেছিলুম এটা হচ্ছে তারই দেহ,—ম’রে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে খাটের উপরে প’ড়ে রয়েছে !

আমরা সবাই এক সঙ্গে আত’নাদ ক’রে শ্মশান থেকে পলায়ন করলুম !

বাড়িতে ফিরে নিজের বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছিলুম।

শেষ-রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, বিছানার উপরে উঠে বসে শুনলুম, সদর-দরজার কড়া নাড়তে নাড়তে আমার নাম ধ’রে কে তীব্রস্বরে ডাকছে—“অবনী ! অবনী ! অবনী !”

এই অসময়ে কে আবার জ্বালাতে এল ? বিরক্ত হয়ে ঘরের দরজা খুলে বাইরে এসেই গুনলুম, পথের উপরে দাঁড়িয়ে কে গান গাইছে :—

“খাবি খায় টিক্‌টিকি

আসে হাঁচি ঝাখ্ দিকি !

হাঁস্ ফাঁস্ মরা হাঁস্, কোথা যাস্—

চই-চই-চই !”

শিউরে উঠে আবার ঘরে ঢুকে আমার দরজায় খিল লাগিয়ে দিলুম !

পরদিন সকালেই খবর পেলুম, মধু-খুড়ো, মাধব আর মানিকের নাম ধরেও কাল শেষ-রাতে কে ডেকে ঐ গান গেয়েছিল ! বলা বাহুল্য, তারা কেউই সাড়া দেয় নি !

রঘু চাটুযো আর খ্যাদারও কোন খবর পেলুম না । তাদের মধ্যে আর দেখা হয়-নি—না হওয়াই ভালো ।

ভুতুড়ে খাদ

এক কলিয়ারী থেকে আর এক কলিয়ারীতে বদলি হয়ে এসেছি ।

কয়লা-কুঠির ডাক্তার । ভারি ঝক্‌ঝক্‌ কাজ । খাদের কুলি-কামিন থেকে আরম্ভ ক'রে ম্যানেজার-সাহেব পর্যন্ত—যে যেখানে আছে, সকলেরই জীবন মরণ যেন আমারই হাতে । আমি যেন তাদের বিধাতা । কারও পায়ে একটুখানি আঁচড় লেগেছে—ডাক্ ডাক্তারকে । কোথাও কোনও কুলিধাওড়ায় হয়ত' রুগী মরছে,—ডাক্ ডাক্তারকে ! খাদের নীচে কুলি মরেছে—সকলের আগে আমাকেই সেখানে ছুটতে হবে ।—সে যাই হোক, চাকরি করতে এসে সে দুঃখ ক'রে লাভ নেই !

বাসাটি মন্দ নয় । টালি দেওয়া খান চারেক ঘর, স্বমুখে দাওয়া উঁচু ছোট একটুখানি রক, রকের নীচেই উঠোন, উঠোনে রান্নার জায়গা ।

চারিদিক ফাঁকা । ভাবলাম, ভালোই হ'লো । আগে যে কলিয়ারীতে ছিলাম,—প্রকাণ্ড কলিয়ারী, ছোটখাটো একটা শহর বললেই হয়, চারিদিকে ধোঁয়া আর বস্তু, দম যেন আটকে আসতো । এখানে তা হ'লেও একটুখানি নিশ্বাস নিয়ে বাঁচব ।

ম্যানেজারবাবু বাঙ্গালী । বড় অমায়িক ভদ্রলোক । প্রথম এসেছি, তাঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয়টা জমিয়ে রাখা ভালো । বিকালে বেড়াতে বেড়াতে সেদিন তার বাঙলোর দিকেই যাচ্ছিলাম । কালোরঙের ভুঁড়িওয়ালো বেটে এক ভদ্রলোক 'আমায় দেখে নমস্কার করে' পথের

মাঝে থমকে দাঁড়ালেন। গৌফগুলি নীচের দিকে বেকে আছে। মুখের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, “আপনিই নতুন ডাক্তার, না? আমি হেড্‌ ক্লার্ক।”

কি আর বলব, ঘাড় নেড়ে একটুখানি হেসে নমস্কার ক’রে এগিয়ে যাচ্ছি, তিনি আমার পিছু নিলেন। বললেন, ‘চলুন তবে ওই দিক দিয়েই যাই, আপনার সঙ্গে গল্প করাও হবে।’

বলেই তিনি নিজের পরিচয় দিতে শুরু করলেন। এখানে চাকরি করছেন প্রায় দশ বছর, অথচ একটি দিনের জন্যেও তিনি কামাই করেননি। বাড়ি তাঁর বেশি দূরে নয়। এখান থেকে মাইল খানেকের মধ্যেই একটা গ্রামে। সন্ধ্যার আগেই রোজ তাঁকে বাড়ি পৌঁছাতে হয়।

কোনও কথাই তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করিনি, তবু তিনি আমায় সাবধান করে’ দিলেন! বললেন, ‘দেখুন, এখানকার নিয়মই হচ্ছে তাই। আপনিও যেন সন্ধ্যার পর আর বাসা থেকে বেরোবেন না। নতুন মানুষ,—জানেন না’, তাই সাবধান ক’রে দিলাম।

বললাম, ‘কেন?’

বলতেই তাঁর সেই কালো গৌফের জঙ্গল ভেদ ক’রে পানে-রাঙা লাল-লাল কয়েকটি দাঁত বেরিয়ে পড়ল। বুঝলাম তিনি একটুখানি হাসলেন।

বললেন, ‘জিজ্ঞেস করবার কিছু নেই বড় ভীষণ জায়গা মশাই। আপনি ভূত বিশ্বাস করেন?’

বললাম, ‘না?’

‘এই মরেছেন। চারিদিকে ভূত মশাই, কলিয়ারীটা ভূতে ভূতে একেবারে ছেয়ে গেছে। সন্ধ্যা হলে এ তলাটে আর জন মনিষি দেখতে পাবেন না খাদের নীচে দিনের বেলাতেই লোকজন নামতে ভয় করে;

বাড়ির কাছাকাছি এককক্ষ উঠেই গেছে। অন্ধকার রাতে এক একদিন দেখেবেন কি ভীষণ ব্যাপার। ঘরে বসেই হয়ত শুনতে পাবেন, ইঞ্জিনের শব্দ হচ্ছে, খাদ চলছে, ঘণ্টা বাজছে, ট্রাম লাইনের উপর ঘড়্ ঘড়্ ঘড়্ ঘড়্ ক'রে কয়লার গাড়ি ঠেলার শব্দ পাচ্ছেন, কিন্তু কাছে গিয়ে দেখুন,—সব চুপ! কেউ কোথাও নেই। সন্ধ্যায় হয়ত দেখলেন, ডিপোয় কয়লার একটি গুঁড়ো পর্যন্ত নেই, সকালে গিয়ে দেখুন—চার-পাঁচ ওয়াগন্ কয়লা গাদা হয়ে গেছে।

বললাম, 'তা হলেত' ভালই বলতে হবে। ভূতগুলো খুব উপকারী বলুন!'

ভদ্রলোক আবার তেমনি দাঁত বের করে একবার হাসলেন বললেন, 'তা' বললে হবে কি, খুন জখম যে লেগেই আছে। এমন মাস গেল না যে, খাদের নীচে দু'চারটে খুন না হচ্ছে। আগে মশাই যা কিছু হ'তো—ওই খাদের নীচেই হ'তো, গত দু'বছর ধরে ভূতগুলো দেখছি ওপরেও উঠে এসেছে। এই ধরুন, আমার আপিসের খাতাপত্র! আজ ঠিক যেমনটি রেখে চাবি বন্ধ ক'রে দিয়ে এলাম, কাল এসে দেখব—সব ওলট-পালট হ'য়ে গেছে—এখানকার জিনিস ওখানে, ওখানকার জিনিস এখানে,—একেবারে তছনচ্ কাণ্ডকারখানা। তবে নষ্ট কিছু করে না—এই যা! আজকাল আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে।'

হেসে জিজ্ঞেস করলাম, 'তাই বুঝি বেলা থাকতে থাকতে আপনাকে বাড়ি পৌঁছাতে হয়?'

ঘাড় নেড়ে ভদ্রলোক জানালেন, 'নিশ্চয়, একদিন যে-কাণ্ড ঘটেছিল মশাই, শুনলে আপনার গা-হাত-পা শিউরে উঠবে। থাক, আজ আমার দেবী হ'য়ে যাচ্ছে,—আর একদিন বলব। এখন চলি। নমস্কার।' বলেই তিনি তাঁর হাত দু'টি তুলে অস্বাভাবিক আর একটি নমস্কার ক'রে ডানদিকে রাস্তা ভাঙলেন।

ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে সেদিন আমার অনেক কথাই হ'লো। বললাম, 'ভূতের কথা কি সব শুনেছি আপনার কলিয়ারীতে,—একি সত্যি ?'

ম্যানেজারবাবু হাসলেন। বললেন, 'শুনেছেন এরই মধ্যে ?'

বললাম, 'শুনেছি, কিন্তু ভূত আবার কি ? আমার তো বিশ্বাস হয় না কোনোদিন।'

ঘাড় নেড়ে ম্যানেজারবাবু বললেন, 'কিছু নয়। তবে খাদের অবস্থা বড় খারাপ। চালগুলো অত্যন্ত নরম। খুব সাবধানে কাজ করতে হয়, নইলে কয়লা কাটতে গিয়ে চাল থেকে পাথর খসে পড়ে; লোকজন প্রায়ই মারা যায়।'

কিছুদিন আগে—না কিছুদিন আগে কেন, অনেকদিন আগে, আমি তখন এখানে ছিলাম না। সিপারন নদীতে সেবছর ভয়ানক বান্ হয়। বানের জল এত বেশি বেড়ে ওঠে যে হঠাৎ একদিন দেখতে না দেখতে বান্ এসে পড়ে—খাদের মুখে। 'চানকের' পথে ছড় ছড় করে জল ঢুকতে থাকে। তাকে আর রুখবে কে ? দিনের বেলা। খাদের নীচে তখন কাজ চলছে। লোকগুলোকে বাঁচাবার অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু দুদিন ধরে ক্রমাগত জল ঢুকেছে, তিন দিনের দিন বান্ যখন কমলো, খাদ তখন ভতি হয়ে গেছে। 'পাম্প' দিয়ে জল তুলে তুলে অনেক কষ্টে নীচে নেমে গিয়ে দেখা গেল—প্রায় পঞ্চাশ জন লোক খাদের যেখানে সেখানে ম'রে পড়ে রয়েছে। বাস, সেই থেকে লোকের ধারণা হলো যে, অতগুলি লোক এক সঙ্গে যেখানে মারা যেতে পারে, ভূত সেখানে আছেই।' এই বলে তিনি খুব জোরে জোরে হো হো করে হেসে উঠলেন।

আমি হাসলাম বটে, কিন্তু কেবলই আমার মনে হতে লাগলো—আহা, অতগুলো মানুষ কোনোদিক থেকে কোনও সাহায্য না পেয়ে

নিভাস্ত্র অসহায়ের মত হাহাকার ক'রে জলে ডুবে মারা গেল,—কারও হয়ত ঘুড়ো বাপ-মা আছে খাদের ওপরে কুলি ধাওড়ায়, কারও ছেলে, কারও মেয়ে কারও স্ত্রী, কারও স্বামী পুত্র—আহা। চুপ করে ভারতে গিয়ে মুখের হাসি আমার মুখেই মিলিয়ে গেল,—সে করুণ দৃশ্য যেন আমি আমার চোখের স্মৃতিতে দেখতে পেলাম।

গল্প করতে করতে সন্ধ্যা হ'লো ম্যানেজার বাবুর চাকর আমাদের কাছে লণ্ঠন দিয়ে গেল। উঠতে যাচ্ছিলাম। তিনি বললেন, 'একটু চা খেয়ে যান।'

চা খেয়ে তাঁর কাছ থেকে যখন বিদায় নিলাম, রাত্রি তখন আটটা।

ম্যানেজারবাবু বললেন, "আলো নিয়ে চাকরটা আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসুক।"

ভাবলাম, 'তিনি ভেবেছেন হয়ত' ভূতের ভয়ে রাস্তায় যদি আমার আবার কিছু বিপদ আপদ হয়। হেসে বললাম, 'না, কিছু দরকার নেই। ভূতের ভয় আমি করি না।'

তিনিও হেসে আমায় নমস্কার ক'রে দরজাটি বন্ধ ক'রে দিলেন।

ফটক পেরিয়ে বাইরে পথে এসে দাঁড়ালাম, দেখি অন্ধকারে তখন চারিদিক থম্ থম্ করছে, কোথাও জন মানবের সাড়া শব্দ নাই। মাথার উপরে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, আকাশটা যেন তারায় ঠাসা। তারই একটুখানি বাপ্শা আলোয় পথের উপর দিয়ে এগিয়ে চললাম।

বাসাটা আমার নেহাৎ কাছে নয়। পথের পাশে দুতিনটে কুলি ধাওড়া পেরিয়ে গিয়ে আম-কাঠালের একটি বাগান, তারপরেও খানিকটা কালো কয়লার গুঁড়ো দিয়ে তৈরী ছোট একটি পথ, তারই

কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে বাঁহাতি একটা পোড়ো বাড়ির মত ভাঙ্গা বাড়ি ; সেইখান থেকে ডানদিকে একটা নিঃ গাছের তলা দিয়ে মিনিট-দুই হাঁটলেই আমার বাসার দরজায় গিয়ে পৌঁছাব ।

কি ষেন ভাবতে ভাবতে আমি সেই বাগানের ভিতর সরু একফালি পায়ে চলা পথের উপর দিয়ে চলেছি । মানুষের পায়ের শব্দ পেয়ে আমার পিছনের কুলি বাঁড়ায় সেই যে একটা কুকুর চেঁচাতে আরম্ভ করেছে, তার চীংকার তখনও থামেনি, হঠাৎ দেখি, কয়েকটা গাছের তলা দিয়ে শুকনো পাতার ওপর খড়মড় শব্দ করতে করতে মস্ত লম্বা কালোরঙের একটা লোক আমার স্মুখে এসে দাঁড়ালো । আচম্কা অন্ধকারে সত্যিই আমি একটুখানি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম । জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি, তার আগেই লোকটা আমার আরও একটুখানি কাছে সরে এসে বললে, 'ডাক্তারবাবু, তুই একবার আয় আমার সঙ্গে ।'

লোকটা বোধ হয় সাঁওতাল । বললাম 'কেন ?'

সে বললে, 'ছেলেটাকে আমার বাঁচাতে হবেক ডাক্তার । তুই যদি না যাবি ত' ছেলেটা মরে যাবেক—তুই আয় ।'

'কি হয়েছে তোর ছেলের ?'

বললে, 'তা জানিনা বাবু, তুই দেখবি চল, আবার তুকে আমি ঘরের কাছে দাঁড়াই দিয়ে যাব ।' গলার আওয়াজ শুনে মনে হলো লোকটা এক্ষুনি হয়ত কেঁদে ফেলবে । আমি আর 'না' বলতে পারলাম না । বললাম 'চল ।'

বাগান পেরিয়ে আমরা আর একটা রাস্তা ধরলাম । সে আমার আগে আগে চলতে লাগলো । জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার নাম কি ?'

বললে 'আমার নাম টুইলা ম্যুঝি ।'

বললাম, 'কতদূর যেতে হবে?'

হাত বাড়িয়ে কাছেই করেকটা খড়ো ঘর দেখিয়ে দিয়ে বললে 'ওইখানে।'
চুপ করে পথ আর কত চলি, তার সঙ্গে কথা কইতে আরম্ভ করলাম।
'খাদে বানি তুই কয়লা কাটিস?'

'ই বাবু।'

'কটি ছেলে তোর?'

'ওই একটি।'

'ছেলেটি কত বড়?'

'তা এনেক বড় বটে।'

'তবু—ক বছরের?'

"কে জানে তা! অতসব জানি না।"

এমনি সব নানান কথা কইতে কইতে পথ আমরা চলেছি' চলেইছি। সামনে হাত বাড়িয়ে যে ঘরগুলো সে আমায় দেখিয়েছিল, যতই এগিয়ে যাই, মনে হয় সেগুলো আরও দূরে। বললাম, 'একি রে টুইলা, কাছে বলেছিলি যে!'

টুইলা বললে, 'ই বাবু, কাছে নয় ত কী?' কিন্তু পথ যেন আর ফুরায় না।

সময় কাটাবার জন্তে আবার কথা শুরু করলাম। 'ছেলেটার তোর কি হয়েছিল প্রথমে?'

টুইলা চুপ করে রইলো।

'প্রথমে হয়েছিল কি? ইংরে?'

টুইলা যেন বিরক্ত হয়ে জবাব দিলে। বললে 'খাদে বান্ টুকেছিল।'

'বান! হঠাৎ আমার ম্যানেজারবাবুর সেই বানের কথাটা মনে পড়লো। বললাম, 'কখন রে? সে.তু' অনেকদিন—'

টুইলা বললে,—‘ই—এনেক দিন।’

বললাম ‘তারপর?’

‘তারপর—আমরা তেখন এনেক লোক ছিলম খাদের ভিত্তরে—
কয়লা কাটছিলম্।’

বললাম, ‘সেখান থেকে কেউ ত’ বাঁচেনি শুনলাম, তুইখাচলি কেমন
করে?’

টুইলা আর জবাব দেয় না।

এবার আমার কেমন যেন মনে হলো। বললাম ‘ইরে টুইলা,
শুনছি নাকি এখানে খুব ভতের ভয়। সতি নাকি?’

হঠাৎ দেখি টুইলা নেই। অন্ধকারে, ভাবলাম, কালো মাতুয়, হয়ত’
খানিকটা এগিয়ে গেছে তাই দেখতে পাচ্ছি না। ডাকলাম,—‘টুইলা’।
কোথায় টুইলা!

এদিক ওদিক আগে পাছে তাকিয়ে দেখি, টুইলা কোথাও নেই।
চারিদিকে দিকচিহ্নহীন অন্ধকার। আর ঝাঁ ঝাঁ পোকাকার, ডাক।
মাথার ভেতরটা চন্ করে উঠলো। সমস্ত শরীরের রক্ত তখন আমার
জল হয়ে গেছে।

পিছন ফিরে ছুটবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ছুটে আমি যাব
কোথায়? চীৎকার করলেই-বা কে শুনবে!... ভাবলাম, মৃত্যু অনিবার্য।
চলতে গিয়ে দেখি, পা দু’টো আড়ষ্ট, গলাটা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে
গেছে।

কোন্ দিক দিয়ে কেমন করে কতক্ষণ যে চলেছি কিছুই আমার মনে
নেই, রাত্রির অন্ধকার কেটে গিয়ে চারিদিক যখন ফসাঁ হচ্ছে, দেখি,
তখনও আমি পথ চলছি। শরীরে তখন আমার শক্তি নেই, পায়ে
জোর নেই, নিতান্ত কেমন যেন মুরিনি বলেই বেঁচে আছি—এমনিই

আমরা খাদের নীচে নেমে গেলাম। এবার আমাদের সঙ্গে আর বেশি লোক গেল না। যেতে চাইলও না। ম্যানেজারবাবু হেসে বললেন, 'পুলিশ যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে, আর ভাবনা কি? ভূতেরও ত' পুলিশের ভয় আছে?'

স্নান হাঙ্গি হেসে নেমে ত' গেলাম! যা থাকে কপালে। একে রাত্রির অন্ধকার, তায় আবার কালো কয়লার সেই পাতালপুরী চারিদিক কালো! তবে আমাদের সঙ্গে আলোও ছিল প্রচুর। প্রত্যেকের হাতেই একটি করে' সেফ্টি ল্যাম্প। পুলিশের ইন্সপেক্টরের হাতে টর্চ।

আগে আগে যাচ্ছে মালকাটার সর্দার, কিন্তু গিয়ে দেখি অবাক কাণ্ড।

মৃতদেহ সেখানে নেই। খালি খানিকটা রক্তের দাগ কালো কয়লার ওপর জমাট বেঁধে রয়েছে দেখলাম। এ-ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে দাঁড়িয়ে আছি। কাবও মুখে কোনও কথা নেই। চারিদিক নিস্তর। খাদের চাল থেকে কোথাও বা খুঁখুঁ করে' ছোট ছোট কয়লার টুকরো খসে' খসে' পড়ছে' কোথাও বা টপ্‌টপ্‌ করে জল পড়ার শব্দ পাচ্ছি। কি কর; যায়?

ইন্সপেক্টরবাবু বললেন, 'আসুন, এদিক-ওদিক খোঁজ করে দেখি, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

বিশ্বাস তাঁর না হবারই কথা। কিন্তু আমরা আর না বিশ্বাস করে' যাই কোথায়। এর আগের বারেও ত' এম্নি হয়েছিল।

খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করলাম। ইন্সপেক্টরবাবু বেশ সাহসী লোক। টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে তিনিই সবার আগে আগে চললেন। সবার পেছনে যেতে আমার ভয় করছিল। কোনোরকমে পাশ কাটিয়ে

কৌশল করে কাউকে জানতে না দিয়ে ফস্ করে' আমি এক সময় মাঝে গিয়ে ঢুকলাম।

খোঁজাব আব অস্ত রইল না। কিন্তু লাশ আর পাওয়া যায় না।

খুব ছোট একটা সুডঙ্গের ভিতর দিয়ে চলেছি, হঠাৎ একটা শিকট চীংকাব। ভয়ানক একটা কিছু অপঘাত ঘটলে মরকুর আগে মানুষ যেমন ক'বে চেঁচিয়ে ওঠে,—এও যেন ঠিক তেমনি একটা গোঙানির শব্দ। একেবাবে ইন্সপেক্টর বাবুব পাষের কাছে। আমবা ত' সব চমকে উঠে শিউবে খানিকটা পিছু হাটতে গিয়ে এ-ওব গায়ে গায়ে লাগলাম বাক। ভবে ত' আমি ম্যানেক্জাবাবকে তখন জড়িয়ে ন'বেছি। সর্বান্ন শিব্শিব ক'বে গায়েব লোমগুলি খাড়া হয়ে উঠেছে। গেলাম আব কি। বাচবাব আব কোনও আশা নেই।

ইন্সপেক্টরবাব ত' অত সাহসী লোক। টেচের আলো ফেলে যেমনি নীচের দিকে তাকিয়েছেন—দেখন, মৃতদেহেব বুকেব ওপব পা দিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে।

'বাপ্।' বল' তিনি লাফিয়ে একেবাবে উলটে এসে পড়লেন আমাব ঘাড়ে। আমি পডলাম ম্যানেক্জাবাবর গায়ে, ম্যানেক্জাব দিলেন একটা কনেষ্টবলেব পা মাড়িয়ে। এমনি কবে সবাই মিলে আমবা ছটোপুটি কবছি, এমন সময়—অবাক্ কাণ্ড। ইন্সপেক্টরেব হাতেব টচ গেল নিবে, অনেক টেপাটেপি করেও কিছুতেই আব জালানো গেল না। তার পরেই একে একে আমাদের প্রত্যেকেব হাতেব আলোগুলো নিব্তে আবস্ত কবল।

প্রাণের আশা তখন একেবারেই ছেড়ে দিলাম।

কাঠ হয়ে আমবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরামর্শ কবলাম—যেমন করে হোক দেশলাই জ্বলে জ্বলে সুডঙ্গের দেওয়াল ধবে' চলুন আমরা ফিরে

যাই। এমন করে এখানে প্রাণ দেওয়ার চেয়ে পালিয়ে যাওয়াই ভালো।
সর্দার বললে ‘চল্ আমি পথ চিনি। দে, একটো জালা কাঠির
বাস্কো দে আমার হাতে।’

আমার পকেটে দেশলাই ছিল, কাপতে কাপতে সেটা বের করে
সর্দারের হাতে দিলাম।

কিন্তু ফস্ ‘ক’রে সর্দার যেই একটা কাঠি জ্বলেছে, তারই সেই
সামান্য আলোতে দেখলাম, কিছুতকিমাকার প্রকাণ্ড একটা দৈত্যের
মত কালো কুচকুচে এক সাঁওতাল এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের স্মুখে।
লম্বা লম্বা হাত দুটো বাড়িয়ে সে আমাদের সূড়ঙ্গের পথ আগলে বলে
উঠলো—‘যাবি কুখা? ছেলেকে আমার বাঁচা এগুতে, তা বাদে যাবি।’

ইম্পেক্টরের পকেটে ছিল রিভল্ভার, চট করে সেটা বের করে’
তিনি ধাঁ করে’ চালালেন এক গুলি। ভীষণ আওয়াজে কানে
আমাদের তালা লেগে গেল।

কিন্তু তৎক্ষণাত্ শুনতে পেলাম, অন্ধকার সূড়ঙ্গের মধ্যে ইম্পেক্টর
চীৎকার করে’ উঠলেন—‘গেলাম। গেলাম। ওরে বাবারে। ছেড়ে
দে বাবা ছেড়ে দে।’

ভূতে মানুষে মারামারি। ইম্পেক্টরের গোঙানির আওয়াজ
শুনতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে যেন তাঁকে আমাদের কাছ থেকে খানিক
দূরে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে। ঝটপট ঝটপট করতে করতে সব থেমে
গেল। শুন্লাম সাঁওতালটা বলছে, ‘গুলি চালাবি আর? চালা
দেখি কেমন মরদ।’

আমরা তখন পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে ঠক্ঠক্ ক’রে
কাঁপছি! ‘আমাকে মেরেছিস্ বানে, ডুবোই, জলের ভিতর ঠিক
ইছুর-মারা করে’। ‘ছেলেটা ছিল, আবার তাখেও মেরে দিলি!’

বলতে বলতে সাঁওতালটা এগিয়ে এলো আমাদের দিকে। ‘কই তুদের ম্যানেজার কই?’

ম্যানেজারবাবু কেঁদে ফেললেন, ‘দোহাই বাবা, আমায় ছেঁড়ে বাবা, আমার কোনও দোষ নেই।’

‘আচ্ছা তুখে না হয় ছেড়ে দিলম্, কই ডাক্তারটো কুই?’ ব’লেই হাত বাড়িয়ে টপ করে’ আমার ঘাড় ধরে’ বললে, ‘আয়, ছাখ্, যদি তুই বাঁচাতে পারিস্।’

আমার তখন দম্ আটকে এসেছে। মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না। গৌঁ গৌঁ করছি।

* * * * *

তারপর কেমন করে যে ওপরে উঠে এসেছি, কেমন করে যে বাড়ি এসে পৌঁছেছি কিছুই জানিনে।

চাকরি ছেড়ে দেবো বলে দরখাস্ত ত’ আগেই করেছি, জবাব এলো কিনা জান্বার জগ্বে বেলাবেলি ত’ গেলাম সেদিন ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে।

গিয়ে শুনি, অদ্ভুত ব্যাপার। কাল রাত্রি থেকে ম্যানেজারকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। খাদের নীচেও না, খাদের ওপরেও না!

সবনাশ! সর্বাঙ্গ আমার শিউরে উঠলো।

তাহ’লে তিনি গেলেন কোথায়?

মেডেল

কয়েক-বছর পূর্বে এ-ঘটনা ঘটেছে, তাই এখন মাঝে মাঝে আমার মনে হয় ব্যাপারটা আগাগোড়া মিথ্যা : আমারও কোন প্রকার শারীরিক অসুস্থতার দরুণ হয়তো চোখের ভুল দেখে থাকবে বা ওই রকম কিছু—কিন্তু আমার মন বলে তা নয়, ঘটনাটি মিথ্যা ও অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেওয়ার কোনো কারণ ঘটেনি। তবে আমার তখনকার অভিজ্ঞতাই সত্যি, এখন যা ভাবছি তাই মিথ্যা।

ঘটনাটি খুলে বলা দরকার।

প্রসঙ্গক্রমে গোড়াতেই এ-কথা বলে রাখি যে, গত দশ বৎসরের মধ্যে আমার শরীরে কোনো রোগ-বালাই নেই, আমার মন বা মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ সুস্থ আছে এবং যে সময়ের কথা বলছি, এখন থেকে বছর-চারেক আগে, তখনও সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলাম।

আমার স্কুল-মাস্টারের জীবনে অত্যাশ্চর্য বা অবিশ্বাস্য ধরনের কখনও কিছু দেখিনি। অন্য পাঁচজন স্কুল-মাস্টারের মতই অত্যন্ত সাধারণ ও একঘেয়ে রুটিন-বঁধা কর্তব্যের মধ্যে দিয়েই দিন কাটিয়ে চলেছি আজ বহু বৎসর।

সে বছর বর্ষাকালে, গরমের ছুটির কিছু পরে একদিন ক্লাসে পড়াচ্ছি, এমন সময় একটি ছেলে আর একটি ছেলের সঙ্গে হাত-কাড়াকাড়ি করে কি একটা কেড়ে বা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করছে, আমার চোখে

পড়লো। আমি ওদের দু'জনকে অমনোযোগিতার জন্তে ধমক দিতে, অন্য একটি ছেলে বলে উঠলো—শ্বর, কামিক্ষে সুধীরের মেডেল কোড়ে নিচ্ছে—

—কার মেডেল? কিসের মেডেল?

সুধীর নামে ছেলেটি দাঁড়িয়ে উঠে বললে—আমার মেডেল শ্বর!

অন্য ছেলেটির দিকে চেয়ে বল্লম—ওর মেডেল তুমি নিচ্ছিলে, কামিক্ষে?

কামিক্ষে ওরফে কামাখ্যাচরণ মৌলিক নামে ছেলেটি বললে—নিচ্ছিলাম না শ্বর, দেখতে চাইছিলাম; তা ও দেবে না।

—ওর মেডেল যদি ও না দেয়, তোমার কেড়ে নেবার কি অধিকার আছে? বোসো। ও-রকম আর করবে না—

কথা-শেষ করে সুধীরের দিকে চেয়ে ক্লাসের ছেলেদের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্বভাব ও সখা থাকার উচিতা সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ একটি বক্তৃতা দেবার পর, ঈষৎ কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞাস করলাম—কই, কি মেডেল দেগি? কোথায় পেল মেডেল?

ভেবেছিলাম আজকাল কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় যে-সব ব্যাডমিন্টন খেলা, সাঁতারের বা দৌড়ের প্রতিযোগিতা প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে, তারই কোনো কিছুতে সুধীর হয়তো চতুর্থস্থান বা ওই ধরনের কোনো সাফল্য লাভ করে ছোট্ট এতটুকু একটা আধুলির মত মেডেল পেয়ে থাকবে—এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক যে, সে সেটা ক্লাসে এনে পাঁচজনকে গর্বভরে দেখাতে চাইবে; এমন কি এই ছুতো অবলম্বন করে ক্লাসগুরু ছেলে হেডমাস্টারের কাছে দলবদ্ধ হয়ে গিয়ে এক বেলার জন্তে ছুটিও চাইতে পারে। সুতরাং মেডেলটা যখন আমার হাতে এসে পৌঁছলো, তখন সেটাকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই হাতে পেতে নিলাম; কিন্তু মেডেলটার

দিকে একবার চেয়ে দেখেই চেয়ারে সোজা হয়ে বসলাম। না, এতো পাড়ার ব্যাডমিণ্টন ক্লাবের বাজে মেডেল নয়, মেডেলটা পুরোনো, বড় ও ভারী, চমৎকার গড়ন!

• —কি জিনিস দেখি!

মেডেলের গায়ে কি লেখা রয়েছে, আধ-অঙ্ককার ক্লাসরুমে ভাল পড়তে বললুম না—ও-পিঠ উন্টে দেখি, মহারানী ভিক্টোরিয়ার অল্প-বয়সের মূর্তি খোদাই-করা।

পকেটে চশমা নেই, মনে হোল আপিস-ঘরের টেবিলে ফেলে এসেছি। ইতিমধ্যে অনেকগুলি ছেলে ভিড় করেছে আমার চেয়ারের চারিপাশে—মেডেল দেখবার জন্যে।

তাদের ধমক দিয়ে বললুম—যাও বোসোগে সব—ভিড় কোরো না এখানে।

একটা ছেলেকে বললুম—কি লেখা আছে মেডেলের গায়ে পড়তো।

ক্লাস-ফোরের ছেলে—অতি কষ্টে ধীরে ধীরে পড়লে—ক্রিমিয়া, সিভাস্টোপোল, ভিক্টোরিয়া রেজিনা।

—ও-পিঠে?

—সার্জেন্ট এস, বি, পার্কিন্স, সিক্সথ্ ড্র্যাগন্স্ গার্ডস্—আঠারো শো চুয়ার সাল—

দস্তুরমত অবাক হয়ে গেলাম। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময় সিভাস্টোপোলের রণক্ষেত্রে কোনো সাহসের কাজ করবার জন্যে এই মেডেল দেওয়া হয়েছিল ইংলণ্ডের সামরিক দপ্তর থেকে ড্র্যাগন্স্ গার্ডস্ সৈন্যদলের সার্জেন্ট পার্কিন্সকে। এতো সাধারণ জিনিস মোটেই নয়!

ক্রিমিয়া!...সিভাস্টোপোল!...চার্জ! অব দি লাইট ব্রিগেড! কিন্তু

কলকাতার নীলমণি দাসের লেনের সুধীর সাহার কাছে সে মেডেল কোথা থেকে এল ?

—এদিকে এস, এ-মেডেল কোথায় পেয়েছ ?

—ওটা আমার স্মরণ !

—তোমার তা বুঝলাম। পেলো কোথায় ?

—আমার দাদু দিয়েছেন স্মরণ !

—তোমার দাদু কোথায় পেয়েছিলেন জানো ?

—হ্যাঁ স্মরণ, জানি। আমার দাদুর বাবার কাছে এক সাংহেব জমা রেখে গিয়েছিল।

—কি ভাবে ?

—আমাদের মদের দোকান ছিল কি না স্মরণ ! মদ খেয়ে টাকা কম পড়লে ওটা বাঁধা রেখে গিয়েছিল, আর নিয়ে যায়নি—দাদুর মুখে শুনেছি।

হিসেব করে দেখলাম ছিয়াশি বছর উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েচে সেই বছরটি থেকে, যে বছরে সার্জেন্ট পার্কিন্স (সে যেই হোক) এ-মেডেল পায়। তখন তার বয়েস যদি কুড়ি বছরও থেকে থাকে, এখন তার বয়েস হওয়া উচিত একশো ছয়। সুতরাং সে মরে ভূত হয়ে গেছে কোন্ কালে !

সেদিন ছিল শনিবার, সকালে স্কুল ছুটি হবে এবং অনেকদিন পরে সেদিন দেশে যাবো পূর্বেই ঠিক করে রেখেছিলাম। আমার এক গ্রাম-সম্পর্কে জ্যাঠামশায় ইতিহাস নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, বেশ পড়াশুনো আছে, গ্রামেই থাকেন। ভাবলাম, তাঁকে মেডেলটা দেখালে খুসী হবেন খুব।

সুধীরের কাছ থেকে মেডেলটি চেয়ে নিলাম, সোমবারে ফেরৎ দেব বললাম।

খুলের ছুটির পরে বাসা থেকে স্ট্রেকেস্টা নিয়ে শেয়ালদ' স্টেশনে এসে আড়াইটের গাড়ি ধরলাম।

দেশের স্টেশনে যখন নামলাম, তখন বেলা সাড়ে পাঁচটা।

ছ'-মাইল রাস্তা হেঁটে বাড়ি পৌঁছুতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল।

সন্ধ্যার অগ্নিগেই হয়তো পৌঁছুতে পারা যেত—কিন্তু আমি খুব জোরে হাঁটিনি। ভাদ্রমাসের শেষ—অথচ বৃষ্টি তত বেশি না হওয়ায় পথঘাট বেশ শুকনো, খটখটে। পথের ধারের বর্ষাশ্যামল গাছপালা চোখে বড় ভাল লাগছিল অনেকদিন কলকাতা-বাসের পরে—তাই জোরে পা না চালিয়ে আশ্বে আশ্বে হেঁটে আসছিলাম।

এখানে প্রথমেই বলি, আমার গ্রামের বাড়িতে কেউ থাকে না। পাশের বাড়ির এক বৃদ্ধা, আমি গেলে রান্না করে দিয়ে আসতেন বরাবর।

আমার এক বাল্যবন্ধু বৃন্দাবন অনেক বছর ধরে বিদেশে থাকে; পিসিমার মুখে শুনলাম, আজ দিন পনেরো হ'ল বৃন্দাবন বাড়ি এসেছে। শুনে বড় আনন্দ হোল, সন্ধ্যার পরেই ওর সঙ্গে দেখা করবো ঠিক করে, চা খেয়ে নদীর ধারে বেড়াতে বার হোলাম—যাবার সময় স্ট্রেকেস্টা খুলে মেডেলটা পকেটে নিলাম। বৃন্দাবনকেও দেখাবো এবং ফিরবার পথে আমার সেই জ্যাঠামশায়কেও জিনিসটা দেখাতে হবে।

যখন নদীর ধারের পথে চলেছি, তখন সন্ধ্যার খুব বেশি দেরি নেই। শেষ ভাদ্রের বেলা, একটু সকাল সকালই সন্ধ্যা নামবে।

নদীর ধারে গিয়ে দেখি—বর্ষার দরুন নদীর জল ভয়ানক বেড়েছে, নদীর জল কূল ছাপিয়ে ছ'ধারের মাঠে উঠে পড়েছে। অনেকক্ষণ বসে রইলাম, সন্ধ্যার অন্ধকার নামলো একটু একটু, বাতুড়ের দল বাসায় ফিরেছে।

কেউ কোনো দিকে নেই।—

এক জায়গায় বর্ষার তোড়ে নদীর পাড় ভেঙে গিয়েচে। অনেকটা উঁচু পাড়, নিচে খরশ্রোতা বর্ষার নদী। জায়গাটা দিয়ে যেতে যেতে একবার কি-রকম ভেঙেচে দেখবার ইচ্ছে গেল। পাড়ের ধারে দাঁড়িয়ে নিচে জলের আবর্ত দেখছি, পাড়টা সেখানে অনেকখানি উঁচু, জল অনেক নিচে—হঠাৎ আমার মনে একটা অদ্ভুত ইচ্ছে জেগে উঠলো।

আমি লাফ দিয়ে পাড় থেকে জলে পড়বো।...

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ইচ্ছাটা যেন ক্রমে বেড়ে উঠেচে...লাফাই...লাফ দিই...অথচ বর্ষার খরশ্রোতা নদী, কুটো ফেললে ছুঁখান হয়ে যায়! আমি সাতার জানি না,--গভীর জল পাড়ের নীচেই।

ইচ্ছাটা কিছুতেই যেন সামলাতে পারছি নে! এমন কি আমার মনে হ'ল আর কিছুক্ষণ থাকলে আমাকে লাফ দিতেই হবে, নইলে আমার জীবনের স্তম্ভ যেন চলে যাবে!...

তাড়াতাড়ি নদীর পাড় থেকে এক রকম জোর করেই চলে এলাম। কারণ, যেন মনে হচ্ছিল এর পর আমার আর যাওয়ার ক্ষমতা থাকবে না, পা দুটো যেন ক্রমশঃ সীসের মত ভারি হয়ে উঠেচে—এর পরে ওই বিপজ্জনক নদীর পাড় থেকে পা দুটোকে নাড়াবার ক্ষমতা চলে যাবে আমার!...

নদীর ধার থেকে বৃন্দাবনদের বাড়ি আসবার পথে ও-সব ইচ্ছে আর কিছু নেই। আমি নিজের মনোভাবে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেলাম—কি অদ্ভুত! ও-রকম হওয়ার মানে কি?

ট্রেনে বসে অতিমাত্রায় ধূমপান করেছিলাম মনে পড়লো। এই ভাদ্রমাসের গরমে অত ধূমপান করা ঠিক হয়নি, তার ওপর বাড়ি এসে ছুঁতিন পেয়ালা চা খেয়েছি। এ-সবেই ও-রকমটা হয়ে থাকবে। নিশ্চয়ই তাই।

বৃন্দাবনের বাড়ি গেলাম। বৃন্দাবনকে অনেকদিন পরে দেখে সত্যিই আনন্দ হোল। ছুজনে অনেক রাত পর্যন্ত বসে নানা গল্প করলাম। অনেক বছর ধরে জমানো অনেক সুখ-দুঃখের কাহিনী।

বড় গরম আজ। কোথাও এতটুকু বাতাস নেই। ভাদ্রমাসের গুমট গরম। বৃন্দাবন বললে—চল ভাই ছাদে গিয়ে বসে গল্প করি, তবুও একটু হাওয়া পাওয়া যাবে। তুই আমাদের এখানে খেয়ে যাবি—মা বলে দিয়েছেন। তোমাদের বাড়িতেও খবর দেওয়া হয়েছে।

ছুজনে ছাদে উঠলাম। বাড়িটা দোতলা। দোতলার ছাদের ওপর একখানা মাত্র ঘর আছে। আমি জানতাম, বৃন্দাবনের কাকা ওই ঘরটায় থাকেন।

দোতলার ছাদে উঠে দেখলাম—বাড়ির পেছন-দিকটায় বাঁশের ভারী-বাঁধা। বললুম—বাড়িতে রাজমিস্ত্রি গাটছে বুঝি, বৃন্দাবন?

—হ্যাঁ ভাই, কাকার ঘরটা মেরামত হবে; আর উত্তরদিকের দেওয়ালটার গা থেকে নোনা-ধরা ইটগুলো বার করা হচ্ছে।

বৃন্দাবন দোতলার ঘরটার মধ্যে ঢুকলো—আমার কিছু মনে কেমন একটা অস্থির ভাব!

খানিকক্ষণ ঘরের মধ্যে গল্প করে আমি একটু জল গেতে চাইলাম—বৃন্দাবন জল আনতে নিচে নেমে গেল, আমি ছাদে পায়চারি করতে লাগলুম।

ছাদে কেউ নেই। অন্ধকার ছাদটা ১০০ যে-দিকটায় রাজমিস্ত্রিরা ভারী-বেঁধে কাজ করছে, পায়চারি করতে করতে সেখানটাতে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি, হঠাৎ আমার মনে হোল,—ছাদ থেকে লাফ দিয়ে পড়িনে কেন?

—বেশ হবে। লাফ দেনো?

প্রায় দুর্দমনীয় ইচ্ছা হ'ল লাফ দেবার ।

—সাব দেওয়াই ভালো । লাফ দিতেই হবে । দিই লাফ ।

এমন সময় বৃন্দাবন ছাদের ওপর এসে বললে—এসো ঘরের মধ্যে, মা
চা পাঠিয়ে দিচ্ছেন ; ওখানে দাঁড়িয়ে কেন ?

আরও প্রায় আধঘণ্টা কথা বলবার পরে, নিচে থেকে চা ও গাবার
এসে পৌঁছুলো । আমরা দুই বন্ধুতে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প-শুভ্রব করলুম ।
তারপর বৃন্দাবন খাওয়ার কতদূর যোগাড় হোল, দেখতে নীচে চলে গেল ।

ঘরের মধ্যে বড় গরম—আমি বাইরের ছাদে খোলা হাওয়ায় আবার
বেড়াতে লাগলাম । রাজমিস্ত্রিদের ভারার কাছে এসে দাঁড়িয়েই আবার
মনে হ'ল—লাফ এবার দিতেই হবে ।

কেউ নেই ছাদে । কেউ বাধা দিতে আসবে না—এই উপযুক্ত
অবসর ! সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের গভীর তলায় কে যেন বলচে—লাফ
দিও না, মূর্থ ! লাফ দিও না, পড়ে চূর্ণ হয়ে যাবে ।

আমার মাথার মধ্যে কেমন ঝিম্ ঝিম্ করচে !

কতক্ষণ পরে জানিনে, এবং কিসে থেকে কি হ'ল তাও জানিনে,—
ইঠাং বৃন্দাবনের চীংকারে আমার চমক ভাঙলো !

দেখি বৃন্দাবন আমাকে হাত ধরে টেনে তুলচে !

—একি সর্বনাশ ! তুমি লাফ দিয়ে পড়লে দেখলাম যেন ! ভাগ্যিস,
বাঁশে পা বেধে গিয়েচে তাই রক্ষা !—কি হোল তোমার ?

আমার মাথা যেন কেমন ঘুরছিল ! গা ঝিম্ ঝিম্ করছিল ।
বৃন্দাবনকে বললাম—আমি ভাই কিছুই জানিনে তো ।...

বৃন্দাবন ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে আমায় শুইয়ে দিলে ।

সকলে বললে—ট্রেনে আসার দরুন আর গরমে, শরীর কি-রকম
খারাপ হয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলাম !

আমি জানি মাথা ঘুরে পড়ে আমি যাইনি, লাফ আমি ইচ্ছে করেই দিয়েছিলাম—তবে ঠিক যে সময়টাতে লাফ দিয়েছি—সে সময়ের কথাটা আমি অনেক চেষ্টা করে কিছুতেই মনে করতে পারলাম না।

ওদের বিছানায় শুয়ে বেশ সুস্থ বোধ করলাম। পাশ ফিরতে হঠাৎ যেন কি-একটা শক্ত জিনিস বুকের কাছে ঠেকলো। পকেটে হাত দিয়ে দেখি সুধীরের সেই মেডেলটা।

আশ্চর্য, এটার কথা এতক্ষণ একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম! বৃন্দাবনকে সেটা দেখালাম। ওদের বাড়ির সকলে মেডেলটা হাতে করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলে।

রাত্রে নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম। আমার বাড়িতে কেউ নেই বর্তমানে, একাঠি থাকি এক ঘরে।

একটা জিনিস লক্ষ্য করছি; যখন থেকে বৃন্দাবনদের বাড়ি থেকে বার হয়ে পথে পা দিয়েছি, তখন থেকেই কেমন এক ধরনের ভয় করচে আমার! বাড়িতে যখন ঢুকলাম, তখন ভয়টা যেন বাড়লো! একা ঘরে কতবার এর আগে শুয়েছি—এমন ভয় হয়নি মনে কোনোদিন।

—না, শরীরটা সত্যিই খারাপ। শরীর খারাপ থাকলে, মনও দুর্বল হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লুম। আমার শিয়রের কাছে একটা বড় জানালা—জানালা দিয়ে বাড়ির পেছনের বন-বাগান চোখে পড়ে। বেশ জোৎস্না উঠেচে—কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর জোৎস্না। হাওয়া আসবে বলে জানালা খুলে রেখেছি।

কতক্ষণ ঘুম হয়েছিল জানিনে, ঘণ্টাখানেকের বেশি হবে না—হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। মনে হ'তে লাগলো আমার শিয়রের দিকের জানালায়

কে দাঁড়িয়ে ! যেন মাথা তুলে—সেদিক চেয়ে দেখলেই তাকে দেখা যাবে !

কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ ভয় হোল। অথচ কিসের যে ভয় তাও জানিনে। এমন ভয় যে, কিছুতেই শিয়রের জানালার দিকে তাকাতে পারলাম না। চোখে না দেখলেও আমার বেশ মনে হোল, জানালার গরাদেতে ছোটো হাত রেখে কে দাঁড়িয়ে আছে—জলন্ত-চোখে সে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে—আমি ওদিকে চাইলেই দেখতে পাবো।

প্রাণপণে চোখ বুজে শুয়ে রইলুম,—কিছুতেই চাইব না। ঘুমোবার চেষ্টা করলাম—কিন্তু ঘরের মধ্যে কোথাও কি ইঁদুর পচেছে ? কিসের পচা গন্ধ ! যেন আয়োড়িন্, লিণ্ট, মলম প্রভৃতির উগ্র গন্ধের সঙ্গে পচা ক্ষতের গন্ধ মেশানো !

এতকাল বাড়িতে থাকা নেই—যার ওপর বাড়িঘর পরিষ্কার রাখার ভার—সে কিছুই দেখাশোনা করে না বোঝা গেল।

কে যেন আমার মনের ভেতর বলচে—চেয়ে দেখ, তোমার মাথার শিয়রের জানালার দিকে চেয়ে দেখ না ?

ঘরের চারিদিকে কিসের যেন একটা প্রভাব—কোনো অমঙ্গলজনক, হিংস্র, উগ্র, অশান্ত-ধরনের ব্যাপারটা,—ঠিক বলে বোঝানো যায় না। আমি যেন ভয়ানক বিপদগ্রস্ত ! সে এমন বিপদ, যা আমাকে মরণের দোর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে—এমন কি সে দোরের চৌকাঠ পার করে অন্ধকার মৃত্যুপুরীর হিম-শীতল নীরবতার মধ্যে ডুবিয়ে দিতেও পারে।

—আমি চাইব না... কিছুতেই চাইব না শিয়রের জানালার দিকে।

কিন্তু যে প্রভাবই হোক, আমার ঘরের মধ্যে, দেওয়ালের এ-পিঠে তার অধিকার নেই। বহুকাল ধরে পূর্বপুরুষেরা বাস্তু-শালগ্রামের অর্চনা

কল্পেচেন এ-ঘরে...এর মধ্যে কারো কিছু খাটবে না। আমার মনই আবার এ-কথাগুলো যেন বললে! অন্ধকার রাত্রে নির্জন ঘরে মন কত কথা কয়!

● জানালার ধাবে কি যেন একটা শব্দ হ'ল!...অদ্ভুত-ধরনের শব্দটা।

কে যেন জানালার গরাদের ওপর ঠোকা দিয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে...একবার...দু'বার তিনবার...ভয়ে আমার বুকের মধ্যে টিপ টিপ করতে লাগলো...কাউকে ডাকবো চীংকার করে?...একবার চেয়ে দেখবো জানালার দিকে জিনিসটা কি? হঠাৎ আমার মনে পড়লো একটা ধাড়ি বেঁজি অনেক দিন থেকে বাইরের দেওয়ালে, কড়িকাঠের খোলে বাসা বেঁধে আছে...আজ বিকালেও সেটাকে একবার দেখেছি। জানালার ওপরকার কাঠে সেটা পোকা-মাকড় বা জোনাকি ধরে...এ তারই শব্দ।

কথাটা মনে হতেই মনের মধ্যে সাহস আবার ফিরে এল।...উঃ ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল যেন!...শরীর অসুস্থ থাকলে কত সামান্য কারণ থেকে ভয় পায় মানুষ! পাশ ফিরে এইবার ঘুমোবার চেষ্টা করলাম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। কিন্তু আমার এভাব বেশিক্ষণ স্থায়ী হ'ল না।

এ ধারণা আমার মন থেকে কিছুতেই গেল না যে, আজ রাত্রে আমি একা নই—আরও কে এখানেই আছে! নিদ্রাহীন চোখে সে আমার ওপর খরদৃষ্টি দিয়ে পাহারা রেখেছে—আমায় সে নিরাপদে বিশ্রাম করতে দেবে না আজ।...

বারবার ঘুম আসে আবার তন্দ্রা ছুটে যায়, অমনি জেগে উঠি; কিন্তু চোখ চাইতে বা বিছানার উপর উঠে বসতে সাহস হয় না...আর সেই শব্দটা মাঝে মাঝে জানালার গরাদের ওপর হতে শুনি—খুব মূঢ় করাঘাতের শব্দ যেন!...

যেন শব্দটা বলচে— চেয়ে দেখো...পিছন ফিরে জানালার দিকে চেয়ে দেখো...

ঘামে দেখি বিছানা ভেসে গিয়েচে...ভাত্রের গুমট গরম কি না !

এই অবস্থায় ভোর হ'ল ।

দিনের আলো ফুটলে, লোকজনের শব্দ কানে যেতে...রাত্রের ভয়টা মন থেকে কোথায় গেল মিলিয়ে ! নিশ্চিন্ত মনে বেলা নষ্টা পর্যন্ত পড়ে ঘুম দিলাম । তারপর উঠে, চা খেয়ে, পাড়ায় বেড়াতে বার হওয়া গেল ।

এই সময় একটা ঘটনা ঘটলো—তখন আমি তার বিশেষ কোনো মূল্য দিই নি—কিন্তু পরে সব কথা মনে মনে আলোচনা করে দেখে সেটা ভারী আশ্চর্য বলেই মনে হয়েছিল ।

ও-পাড়ার পথে আমার সেই জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে দেখা, যাকে দেখাবার জন্যে আমি মেডেলটা কাল রাত্রে সঙ্গে নিয়েই বেরিয়েছিলাম—কিন্তু বৃন্দাবনদের বাড়িতে নিমন্ত্রণের জন্যে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারিনি...

আমায় দেখে তিনি বল্লেন—এই যে স্বরেন, ভাল আছ ? কাল তুমি এসেছ দেখলাম, তখন অনেক রাত, তাই আর ডাকলাম না । বোধ হয় বৃন্দাবনদের বাড়ি থেকে ফিরছিলে ? আমি তখন ছাদে পায়চারি করছি, যে গরম গিয়েচে বাবা কাল রাত্রে...তোমার সঙ্গে লোক রয়েছে দেখে আরও ডাকলাম না । ও লোকটি কে ? খুব লম্বা বটে—যেন শিখ কি পাঞ্জাবীর মত লম্বা—তোমার বন্ধু বুঝি ? বাঙালীর মধ্যে এমন চেহারা—বেশ, বেশ !

আমি অবাক হয়ে জ্যাঠামশায়ের মুখের দিকে চেয়ে বললাম—আমার সঙ্গে লম্বা লোক কাল রাত্রে ! সে কি জ্যাঠামশায় ?

জ্যাঠামশায় আমার চেয়েও অবাক হয়ে বল্লেন—তোমার সঙ্গে লোক

ছিল না বলচো ? একা যাচ্ছিলে ? আমার চোখের দৃষ্টি একেবারে কি এত খারাপ হয়ে যাবে বাবা...

আমি হেসে বললাম—তাই হবে জ্যাঠামশায় ! চোখে কি-রকম ঝাপুশা দেখে থাকবেন । বয়েস হয়েছে তো ! আমার সঙ্গে কেউ ছিল না । আমি ঝুকাই বৃন্দাবনের বাড়ি থেকে ফিরছিলাম । আমার হাতে আলো ছিল না, তা ছাড়া আপনাদের বাড়ির সামনের আমগাছটার ছায়া...কি-রকম আলো-আধার দেখেচেন চোখে...অমন ভুল হয়...

জ্যাঠামশায় যেন রীতিমত হতভম্ব হয়ে গেলেন ! বললেন—কি আশ্চর্য কাণ্ড ! এতটা ভুল হবে চোখের ?...আমগাছের এদিকে যখন তুমি টর্চ জ্বাললে, তখন দেখলাম তুমি আর তোমার ঠিক পেছনে একজন লম্বা মত লোক...তারপর তুমি টর্চ নিবিয়ে আমগাছের ছায়ার মধ্যে ঢুকলে, তখন জোৎস্নার আলো আর আমগাছের ছায়ার অন্ধকারে আমি বেশ দেখতে পেলাম, লোকটা তোমার পেছনে পেছনে যাচ্ছে...তোমার মাথার চেয়েও যেন একহাত লম্বা...তোমার একেবারে ঠিক পেছনে...তবে খুব ভালো তো দেখতে পেলাম না...অতদূর থেকে আর আলো-অন্ধকারের মধ্যে স্পষ্ট কিছু দেখা গেল না তো ! এমন কি, একবার এ পর্যন্ত মনে হ'ল তোমায় ডেকে জিজ্ঞেস করি তোমার বন্ধুটি কে ?...একেবারে এত ভুল হবে চোখের ?

জ্যাঠামশায়কে পুনরায় বুঝিয়ে বললাম, আমার সঙ্গে কাল কেউ ছিল না । আমি একাই ছিলাম, স্মরণে তাঁর দৃষ্টিশক্তির গোলমাল ছাড়া এ-ব্যাপারের অন্য কোনো সিদ্ধান্ত করা চলে না ।

সারাদিন বৃন্দাবনের সঙ্গে আড্ডা দিয়া কাটানো গেল । গতকল্য রাত্রে ভয়ের ব্যাপার দিনের আলোয় এত হাস্যকর বলে আমার নিজের কাছেই মনে হ'ল যে, বৃন্দাবনকে সে কথাটা বলিও নি ।

রাত্রে ট্রেনে কলকাতায় ফিরবো। বৃন্দাবনদের বাড়ি থেকে চা খেয়ে বাড়ি এসে স্মৃটকেস্টা নিয়ে স্টেশনের দিকে যখন রওনা হয়েছি, তখনই সঙ্কার অঙ্কার বেশ নেমেচে।

বাউরি-পাড়ার বড় বাগানটার মধ্যে দিয়ে যখন আসছি, তখন আমার মনে হ'ল—আমার পেছনে পেছনে কি যেন আসচে! বাগানটা পার হতে প্রায় পাঁচ ছ' মিনিট লাগে—মস্ত বড় বাগান।

বাগানের ঠিক মাঝা-মাঝি এসে হঠাৎ একবার পেছন ফিরে চাইলাম কি ভেবে।

সঙ্গে সঙ্গে আমার সারা দেহ যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল! আচম্কা ভয়ে আমার সর্বশরীর কাঠ হয়ে গেল!

কে ওটা ওখানে দাঁড়িয়ে?

রাস্তা থেকে একটু পাশে আগাছার জঙ্গলের মধ্যে আধ-অঙ্কার এক অদ্ভুত মূর্তি! খুব লম্বা, তার মাথায় ঘোড়ার বালামচির সেই এক লম্বা ধরনের টুপি, পাতলা লোহার চেন দিয়ে খুতনির সঙ্গে বাঁধা—ছবিতে গোরা সৈনিকদের মাথায় যে ধরনের টুপি দেখা যায়! মূর্তিটা যেন নিশ্চল নিস্পন্দ অবস্থায় আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে!

আমার কাছ থেকে মাত্র দশ গজ কি তারও কম দূরে! মরিয়ার মত আর একটু এগিয়ে গেলাম। এই ভয়ানক কৌতূহল আমাকে চরিতার্থ করতেই হবে যেন! মূর্তি নড়ে না, চড়ে না,—যেন নিশ্চল পাথরের মূর্তি! কিন্তু বেশ স্পষ্ট দেখছি, সাত-আট গজ মাত্র দূরে তখন মূর্তিটা। তার বালামচির লম্বা টুপি ও ইস্পাতের চেনের স্ট্রাপ্ স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

আমার পা ঠক ঠক করে কঁাপতে লাগলো, সারা দেহ কেমন অবশ হয়ে আসচে, মাথাটা হঠাৎ বড় হালকা হয়ে গিয়েছে। বোধ হয় আর

আধ মিনিট এ ভাবে থাকলে মূর্ছিত হয়ে পড়ে যেতাম—কারণ, সেই ভীষণ মূর্তির মুখোমুখি আমি দাঁড়িয়ে—আমার পা দুটো বেজায় ভারী হয়েছে—নড়বার উপায় নেই মূর্তির সামনে থেকে।

কিন্তু ঠিক সেই সময় বাউরি-বাগানের পথে লর্ধন নিয়ে কারা চুকলো। দুইজন জন লোকের গলায় শব্দ শুনে আমার সাহস ফিরে এল।

আমি ওদের ডাক দিলাম চীৎকার করে। ওরা ছুটে এল।

আমায় ওখানে বনের মধ্যে দেখে তারা খুব আশ্চর্য হয়ে বলল—
ওখানে কি বাবু? কি হয়েছে?

লর্ধন তলে ওরা মুখ দেখে বলল—ও আপনি? কি হয়েছে আপনার? মুখ একেবারে সাদা ফাকা সাদা হয়ে গিয়েছে—ভয়-টয় পেলেন না কি? বাউরি-বাগান জায়গাটা ভাল নয়। সন্ধ্যার পর এখানে অনেক ভয় পায়।

ওদের লর্ধনটা শব্দ উঠ করে তলে ধরলে আমার মুখে, সেই আলোয় দেখলাম—সামনের মূর্তিটা তখনও সেখানে ঠিক সেই রকম দাঁড়িয়ে! একজন বললে—কি দেখছিলেন এখানে দাঁড়িয়ে বাবু—এই ষাঁড়া গাছটা?

একজন বললে—গাছটার ডাল-গালা কেটে মাথায় ঝোপের মত করে রেখেছে, যেন মানুষ বলে অঙ্ককারে ভুল হয় বটে—চলে আসুন বাবু!

আমিও দেখলাম ষাঁড়া গাছই বটে। গাছটা কে ছেঁটে রেখেছে! মাথার দিকের পাতাগুলো ছেঁটে দেখতে হয়েছে ঠিক হস-গার্ডস্দের ঘোড়ার বালামচির টুপি!

লোকের চোখের কি ভুলই হয়! কাল আমি আবার জ্যাঠামশায়কে চশমা নিতে বলছিলাম! ভেবে লজ্জা হোল মনে মনে। তিনি বৃদ্ধ

লোক, তাঁর চোখের ভুল তো হোতেই পারে—আমারই যখন এই অবস্থা !

ওরা আমার আলো ধরে স্টেশনে পৌঁছে দিলে । পরের দিন শুলে-সুধীরের মেডেলটা ফেরৎ দিলাম ।

সুধীর বলে—আপনাকে দাছ একবার ডেকেছেন, আমার সঙ্গে ছুটির পর আমাদের বাড়ি আসুন । নিয়ে যেতে বলেছেন ।

সুধীরের দাছ বলেন—যাক আমার বড় ভয় হয়েছিল মাস্টারবাবু! সুধীরের কাছ থেকে মেডেলটা নিয়ে গিয়েচেন দেশে, শুনলুম কিনা? আপনার দেশের ঠিকানা জানতুম না—তা হলে একটা তার করে দিতাম । ও মেডেলটা আমার বাবাকে একজন গোরা সৈন্য দিয়ে যায়—আমি তখন জন্মাই নি । বাঁধা দিয়েছিল আর উদ্ধার করতে পারিনি । বেজায় মাতাল আর গৌয়ার লোকটা । ও মেডেলের বিপদ হচ্ছে—আমাদের বংশের লোক ছাড়া অন্য কেউ নিলে তার বড় বিপদ ঘটে । আমার এক ভগ্নীপতি একবার কিছুতেই শুলে না—অনেক কাল আগের কথা—বাড়ি নিয়ে গেল মেডেল দেখাতে ; সেই দিনই সন্ধ্যার সময় ছাদ থেকে পড়ে মারা গেল । মৃতদেহের পকেট থেকে মেডেলটা বেরুলো ।

আমি কলের পুতুলের মত শুধু বললাম—ছাদ থেকে ? পকেটে মেডেল পাওয়া গেল ?...

—হ্যাঁ মাস্টারবাবু ! আমার নিজের ভগ্নীপতি, মিথ্যে কথা তো বলবো না । আজ সাতাশ-আটাশ বছর আগের কথা । ওটা আরও দু'একজন নিয়েচে—তক্ষুণি ফেরৎ দিয়ে গিয়েচে । বলে,—রাত্রে ভয় পায়, গা ছম্ ছম্ করে । কে যেন পেছনে 'ফলো' করচে এমন মনে হয় ! ও বাইরের লোকের সহ্য হয় না । প্রাণ পর্যন্ত বিপন্ন হয় ।

তাই ভাবছিলুম, একটা তার করে দেবো। চললেন? বসবেন না?
আচ্ছা মমস্কার!

একটা কথা বলা দরকার। মাসখানেক পরে আমি আবার দেশে
যাই। বাউরি-বাগানে ঢুকে যেখানে সে-রাত্রে ভয় পেয়েছিলাম, সেদিকে
চেয়ে দেখে সে ষাঁড়াগাছটা কোথাও আমার চোখে পড়লো না। যে
আমগাছটার ধারে ষাঁড়াগাছটা দেখেছিলাম, সেখানে দিনমানের বেশ
ডাল করে দেখেছি—কোথাও সে ষাঁড়াগাছ নেই—বা গাছ কেটে নিলে
যে গুঁড়িটা থাকবে, তারও কোনো চিহ্ন নেই।

কস্মিন্‌কালে সেখানে একটা বড় ষাঁড়াগাছ ছিল বলে মনেও হয় না
জায়গাটা দেখে।

ডাক্তারের সাহস

বরাহনগর জায়গাটার নাম সকলেই জানে। কলকাতার উত্তরে মাইল দুই গেলেই বরাহনগর। আজকাল শ্যামবাজার মোটর বাসে যাওয়া যায়, আগে যেতে হতো হেঁটে কিম্বা 'শেয়ারের' গাড়িতে। শেয়ারের গাড়ি ছাড়ত কোম্পানির বাগানের মোড় থেকে, এক একজনের চার আনা ভাড়া। কলকাতায় যাতায়াত করতে গেলে এ ছাড়া আর উপায় ছিল না।

বরাহনগরের বড় রাস্তার দুধারে তখন কলকারখানা, মুটে মজুর, দাকান বাজার, পাট আর ভূষিমালের আড়ৎ—এই সবের ভিড় ছিল বেশি। এদের ধারে ধারে শ্রমিকদের বস্তুগুলো দেখা যেত। দিনের বেলায় পথে সোরগোল, হৈ চৈ, গরুর গাড়ির দল, জনমজুরের হালা, মালগাড়ির আমদানি-রপ্তানি, এমন কি মারামারি পর্যন্ত লেগে থাকত, কিন্তু সন্ধ্যা হ'লেই তাদের আর চিহ্ন পর্যন্ত নেই, পথ হয়ে যেত নির্জন মরুভূমি, রাতের বেলা সে পথে হেঁটে যাওয়াও নিরাপদ ছিল না, মাঝে মাঝে এক আধটা কুকুর কেবল ডাকতে ডাকতে চ'লে যেত। অনেক অসতর্ক পথিক নাকি অনেক দিন রাতে এই পথে গুণ্ডাদের দ্বারা লাহিত হয়েছিল।

ভদ্রলোক কয়েকজন যে পাড়ায় থাকতেন, সে পাড়াটা গঙ্গার কাছাকাছি। তাঁরা স্টীমারে কলকাতায় আনাগোনা করতেন। সকালের দিকে বেরোতেন, আবার ফিরে আসতেন দিনের আলো থাকতে। তার

একটা কারণ ছিল। যে পথটা দিয়ে তাঁরা পাড়ার ভিতরে ঢুকতেন, সেই পথের দক্ষিণ দিকে একটা প্রকাণ্ড পুরান বাড়ি অনেকদিন থেকে পড়ে ছিল, এবং সেই বাড়ির ধার দিয়ে সন্ধ্যার পর হেঁটে যাওয়া তাঁরা স্টিচিৎ মনে করতেন না। বাড়িটা এখানকার পূর্বকালের জমিদার বংশের। এখন সে জমিদারও নেই, তাদের আগেকার ঐশ্বর্যও নেই, কেউ মরে গেছে, কেউ গেছে ছেড়ে—কিন্তু এই অট্টালিকা এখনো তার ভগ্ন দেহ নিয়ে অতীতকালের স্ববির প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাড়িটা জনহীন, নানা আগাছায় পরিপূর্ণ, বাড়ুড় আর চামচিকের বাসা শেকাল আর সাপের অবাধ লীলাভূমি, শুধু তাই নয়, লোকেব বিশ্বাস এ বাড়িতে নাকি কোনো কোনো গভীর বাত্রে মানুষের কান্না শোনা যায়। আগেকার সেই জমিদারের দুইটি মেয়ে নাকি এ বাড়িতে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। অর্থাৎ এ বাড়ির অন্তর মহলে ভূত আছে।

ভূতের কথা শুনলে আর রক্ষা নেই। ভগবানের চেয়ে ভূতকে ও পাড়ার লোক বেশি মানে আর ভয় করে। স্বতরাং অন্ধকার হলে গুপ-পথ দিয়ে আর কেউ হাঁটে না।

কিন্তু চাটুযোদের জামাই এ সব আজগুবি কথা হেসেই উড়িয়ে দিলেন। তিনি নতুন ডাক্তারি পাশ করেছেন। কুস্তি-করা দেহ, বিশাল তাঁর বুকের ছাতি, শিলং পাহাড় থেকে সেদিন একটা প্রকাণ্ড বাঘ শিকার করে এনেছেন। তাঁর ভয়ানক সাহস। ভূতটুত তিনি গ্রাহ্য করেন না।

বড়দিন উপলক্ষে তিনি খুববাড়িতে বেড়াতে এসেছেন! এ পাড়ার সকলের সঙ্গেই তাঁর পরিচয় হয়েছে, সবাই তাঁকে ডাক্তার বলে ডাকে।

ছেলে-ছোকরাদের দলে তাঁর নাম শ্রীক খুব। একদিন ভূতের বাড়ির আলোচনায় তিনি উৎসাহভরে বললেন, যদি একটা রাত আমি ও বাড়িতে কাটিয়ে আসতে পারি তাহলে তোমরা আমাকে কি খাওয়াবে ?

ছেলেরা অবাক হয়ে বললে, একটা রাত ? আপনি বলেন কি ডাক্তারবাবু ? দু ঘণ্টার বেশি যদি আপনি থাকতে পারেন তবে কি বলেছি।

ডাক্তার প্রথমটা হেসেই অস্থির। তারপর বললেন, কত বাজি ধরবে বলো।

ছেলেরা বললে, বাজি ? আপনি যা চাইবেন ফিরে এলে পাবেন। আচ্ছা সেই ভালো।

কথাটা ছড়িয়ে পড়তে দেরি হোলো না। পাড়ার বিজ্ঞ লোকেরা এসে বাধা দিয়ে বললেন, অল্প বয়সে আমরাও জল চিবিয়ে খেয়েছি কিন্তু ভূতকে মেনেছি চিরকাল। তুমি ও বাড়িতে যেয়ো না বাবা। একটা ভালো মন্দ ঘটলে তখন—

ডাক্তার হেসে বললেন, আমাদের জাতের অবনতির একটা কারণ, আমাদের ভূতের ভয়।

আমাদের কথা তবে শুনবে না ?

আজ্ঞে না।

শুভরবাড়ির সকলে কার্নাকাটি ক'রে অস্থির। এমন সর্বশেষে ডাকাত জামাই তাদের না হলেই ভালো ছিল। ডাক্তার বললেন, আমাকে যদি আপনারা বাধা দেন, তাহলে ভবিষ্যতে আপনাদের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

শাশুড়ী বললেন, বাঁচলে ত সম্পর্ক ! সম্পর্ক যাক বাবা, তুমি প্রাণে বেঁচে থাকো।

ডাক্তার কোনো কথা শুনলেন না। তাঁর বন্দুক আছে, কুকুর আছে, দেহে অপরিসীম শক্তি—তাঁর ভয় কি? সকলের বাধা নিবেদন অগ্রাহ্য করে তিনি প্রস্তুত হতে লাগলেন।

৩ সেদিন ছিল অমাবস্যা। ডাক্তার কোর্টপ্যান্ট পরে বন্দুক হাতে নিয়ে টর্চটা পরীক্ষা করে হেসে বললেন, রেডি।

রাত তখন দশটা বাজে। পাড়ার ছেলেরা দল বেঁধে লাঠিসোঁটা হাতে নিয়ে সোরগোল করে একবার সেই প্রকাণ্ড বাড়িটার ভিতরে তন্ন তন্ন করে দেখে এল। শীতের দিন, স্তূতরাং বিছানা এবং আনুষঙ্গিক জিনিসপত্রও দিয়ে আসা হোলো। বড় একটা ঘড়ি রইল টেবিলের ওপর, একটা জলের কুঁজো আর কাঁচের গ্লাস, একটা লাঠি। এবং বলা বাহুল্য, কারবাইডের একটা উজ্জ্বল আলো। টমি—চিরবিশ্বস্ত টমি ছিল সঙ্গে সঙ্গে। কুকুরটা প্রকাণ্ড, বাঘ শিকার করতে সাহায্য করে।

দশটার পরে এক সঙ্গে সবাই বিদায় নিলে। তারা তখন এই বাড়ির ভয়ানক অন্ধকার গহ্বর থেকে পাল্লাতে পারলে বাঁচে। কেউ আর কোনোদিকে তাকাতে সাহস করলে না পাছে কিছু বিভীষিকা তাদের চোখে পড়ে যায়। ডাক্তার যে একা এই জনহীন অন্ধকার প্রাসাদের মধ্যে নির্বাসিত হয়ে রইল, এবং তার ভাগ্যে যে কিছু একটা ঘটবেই, এই কথা ভাবতে ভাবতে সবাই যে যার বাড়িতে গিয়ে পৌঁছল।

ঘরের দরজা জানলা ডাক্তার একে একে সব বন্ধ করে দিলেন। কোথাও আর এতটুকু ফাঁক নেই, বাইরে বাতাস জোরে বইলেও আর কোথাও শব্দ হবে না। চারিদিক নিশব্দ, নিস্তব্ধ। এই বিশাল অট্টালিকার বাইরে যে রাস্তাঘাট আছে, লোকালয় ও মানুষ আছে, কর্মকোলাহলময় জগৎ আছে তা কিছুই বোঝবার উপায় নেই। এখানে

শত শত মানুষের মৃত্যু ঘটলেও কেউ কোনোদিন জানতেও পারবে না।
অমাবস্কার অন্ধকার যেন এই প্রেতপুরীকে উদরসাৎ করেছে।

ঘড়িটায় টিক্ টিক্ শব্দ হচ্ছে। এগারোটা বাজল। নিজের নিশ্বাসটা
যে ইতিমধ্যে কখন ভারী হয়ে উঠেছে ডাক্তার বুঝতে পারেননি।
পাঁচজনে আগে থাকতে ভয় দেখিয়ে দিয়েছে, তাই এই দুর্বলতা।
মনে হোলো ঘড়িটায় যেন আরো একটু আশ্বস্ত শব্দ হলে ভালো হয়।
ওটা ভয়ানক জীবন্ত, অবাধ্য। বিছানার ওপর বসে ডাক্তার একবার
এদিক ওদিক তাকালেন। দেয়ালগুলো জীর্ণ, তাব গায়ে নানাবকম
আঁজিবুঁজি কাটা,—অনেকটা যেন মানুষের কঙ্কালের মতো।

খুট খুট—

ডাক্তার চমকে ফিরে তাকালেন। না, কেউ নয়, বাতাসের শব্দ।
না, বাতাসের নয়, বোর হয় কোনো পোকামাকড়ের আওয়াজ। কিন্তু
কোন দিকে? জানলায় না দবজায়?

খুট খুট—

কে ধাক্কা দিল দরজায়? টমি মুখ তুলে তাকালে। একবার সে
একটু গৌঁ গৌঁ ক'রে উঠল, সে যেন বাঘের সঙ্কান পেয়েছে। না, কেউ
নয় বাতাস। পুবান দরজা, বাতাসে একটু নড়ে বৈ কি। টমি তাব
প্রভুব কোলের কাছে আবার মুখ নীচু ক'রে প'ড়ে রইল। ডাক্তার
হাত বুলিয়ে দেখলেন তার বন্দুকটা ঠিক আছে কিনা। নিজের হাতটা
যেন সহজে আর নড়তে চাইছে না। কেমন যেন মনে হতে লাগল,
নিজের ওপর কত'ত্ব তিনি হাবিয়ে ফেলছেন। তবু, অনেক চেষ্টায়
তিনি গায়ে ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

চোখ বন্ধ করবার চেষ্টা করলে কিন্তু পলক পড়ছে না, চোখের তারা
যেন স্থির হয়ে গেছে, পাথরের মত প্রাণহীন। ঘড়িটা টিক্ টিক্

করছে। ওটা কেন জীবন্ত মানুষের মাথা, কেন ওর চোখ কান নাক আছে, ডাক্তারের দিকে চেয়ে হাসছে। প্রেতের মতো হাসি। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ল দেয়ালের গায়ে। ওকি? দেয়ালের সেই আঞ্জিবুঁজি, সেই মানুষের কঙ্কালটা নডছে কেন? ডাক্তারের বুকের ভিতরকার রক্ত জমাট বেঁধে এল। কঙ্কালের গায়ে মাংস লাগছে একটু একটু ক'রে। হাত, পা, বুক, মাথা, মুখ। উজ্জ্বল আলোয় সেই কঙ্কাল বিরাট দানবের চেহারা নিয়ে দেয়ালে উঠে দাঁড়াল। এবাব হাত বাড়িয়ে তার দিকে এগিয়ে আসবে।

হাত বাড়িয়ে ডাক্তার বন্দুকটা ধবধাব চেঁচা করলে কিন্তু হাত উঠল না। কই, বন্দুকটা ত তার কাছে নেই? কে নিলে? গলা—ডাক্তারের গলাটা কে টিপে ধরছে? স্বর নেই, চীৎকার নেই, নিশ্বাস নেই। তিনি নডবার চেঁচা কবলেন কিন্তু সম্ভব হোলো না, খাটের সঙ্গে তাঁকে বেঁধে দিয়েছে।

ডাক্তার জ্ঞান হারাননি, খুব সাহসী লোক তিনি। চেয়ে দেখলেন, আশ্চর্য, জলের কুঁজোটা ঘরের মেঝের ওপর পায়চারি ক'রে বেড়াচ্ছে, কাঁচের গ্লাসটা ছুটো ডানা মেলে প্রজাপতির মতো উডছে। হ্যা, এইবার ডাক্তার একটু ভয় পেয়েছে। ভয়ে তাঁর রোমকূপগুলো আতঁনাদ ক'রে উঠল।

খট্ খট্ খট্—

কিসের শব্দ? কই, টমি ত আর গৌঁ গৌঁ ক'রে উঠল না? ডাক্তার প্রাণপণে টমির গায়ে একটা চিম্টি কাটল; এত জোরে যে, টমির গায়ের মাংস খানিকটা তার আঙ্গুলে ছিঁড়ে উঠে এল। কিন্তু কই, টমি ত জাগল না? তবে? তবে? বেঁচে আছে ত? টমি-রোঁচে নেই, তার নিশ্বাস পড়ছে না, তার সর্বশরীরে এক বিন্দু প্রাণ নেই,

য'রে সে কাঠের মতো প'ড়ে রয়েছে। এপাশে বন্দুক নেই, ওপাশে টমি নেই।

ঘড়িটার আর টিক টিক শব্দ হচ্ছে না, সেটা থেমে গেছে; কে দিলে খামিয়ে? টেবলটা এইবার নড়ে উঠল, চারটে পায়া ছুড়িয়ে নাচতে লাগল। টমি, টমি? টমি বেঁচে নেই, বা হাতের কাছে তার মৃত দেহ, অসাড়, অচেতন। জলের কুঁজোটা ঘুরছে, কাঁচের গ্লাসটা উড়ছে, টেবিলটা নাচছে। আর—আর সেই দানবটা হাসছে তাঁর দিকে চেয়ে।

হঠাৎ সশব্দে দরজা জানলাগুলো খুলে গেল। ডাক্তার শিউরে উঠলেন। কা'রা ঢুকছে ঘরে? বড় বড় মাথা, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল,—পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকারের মতো। মানুষ নয়, দানব নয়, এরা যেন আরো বিচিত্র। গভীর রাত্রির অন্ধকারে এরা এসেছে কঙ্কালটার সঙ্গে ষড়ষন্ত্র করতে।

আলো কই, আলো? কারবাইডের আলোটা যেন পাগলের মতো ঘরের চারিদিকে ছুটছে। কে তাকে তাড়া করেছে, কিন্তু পালাতে পারছে না, যন্ত্রণায় ছটফট করছে। যারা ঘরে ঢুকেছে তারা নিশ্বাস ফেলছে, দ্রুত নিশ্বাস, ঝড়ের মতো তার শব্দ।

ডাক্তারের সর্বাঙ্গ হিম হয়ে এল। সে কেঁদে ওঠবার চেষ্টা করলে পারলে না। গলা তার বন্ধ, হাত পা বন্দী, চোখ দুটো অচেতন। দেখতে দেখতে সেই দানবের হাতখানা তার মাথার দিকে এগিয়ে এলো। আন্সে আন্সে মাথাটা ছুঁয়ে স্ফুড়স্ফুড় দিতে লাগল, মাথার সব চুলগুলো দাঁড়িয়ে উঠেছে।

আঃ আঃ—খাটখানা কে নাড়ছে! ডাক্তার আবার চীৎকার করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সেই হিংস্র প্রেতের দল তাঁর বুকের ওপর চেপে বসেছে তাকে নড়তে দিলে না। খাটখানা দেখতে দেখতে তাঁকে

নিম্নে শূন্যে উঠতে লাগল। ডাক্তারের মাথাটা ঘুরছে! টমি, টমি! টমি ম'রে গেছে কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল, টমির মুখটাও দানবের মতো বদলে গেছে, টমি নখর বিস্তার ক'রে তার দিকে মুখব্যাদান ক'রে এগিয়ে আসছে।

বিশ্বাসঘাতক! তোমার এই কাজ?

টমি-দানব হেসে উঠল। ধারালো দাঁত দিয়ে ডাক্তারের পাজর কামড়ে ধরল।

খাটখানা শূন্যে উঠছে। মহাশূন্যের ঘন অন্ধকার দেশে। আরো— আরো উচুতে দানবের দেশে তাকে নিয়ে যাবে, ভূত প্রেতের রহস্য-রাজ্যে। উর্ধ্বদেশে খাটখানা উড়ে যাচ্ছে, দূরে, অতি দূরে,—ওই যা, তাদের হাত থেকে খাট খ'সে গেল! ডাক্তার বেগে নীচের দিকে প'ড়ে যাচ্ছেন, হয়ত কোনো মহাসমুদ্রের জলে তিনি আছাড় খেয়ে প'ড়ে তলিয়ে যাবেন। গেল, গেল—

ডাক্তারবাবু, ও ডাক্তারবাবু?

দরজায় ধাক্কা পড়তেই ডাক্তারের ঘুম ভাঙল। বুকটা ধড়ফড় করছে! চোখ চেয়ে দেখলেন, সকালের আলো জানলা দরজার ফাঁক দিয়ে ভিতরে এসে পড়েছে! সর্বশরীর তাঁর তখনো কাঁপছে।

দরজা খুলুন ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার চেয়ে দেখলেন, সব ঠিক আছে। সেই আলো, ঘড়ি, টেবিল, কুঁজো ও গ্লাস, তার বন্দুক আর টমি। গলায় আওয়াজ দিয়ে তিনি বললেন, যাই হে, দাঁড়াও।

দিনে-দুপুরে

হাজরা রোডের মোড়ে ট্রামের জগ দাঁড়িয়ে আছি, বেলা দুপুর। বালিগঞ্জের ট্রাম আর আসে না, এদিকে ভাদ্রমাসের রোদ্দুর পিঠে চড়্‌চড়্‌ ক'রে ফুটছে আলপিনের মতো। ঐ এতক্ষণে কালীঘাটের পুল থেকে আন্তে-আন্তে নামতে দেখা যাচ্ছে শ্রীযুক্ত ট্রামকে।

এমন সময় রাস্তা পার হ'য়ে ছোটো একটি মেয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। তাকে অত লোকের মধ্যেও আমি লক্ষ্য না-ক'রে পারলুম না। কারণ চেহারাটা তার ভদ্রঘরের মেয়ের মতোই, কিন্তু কাপড়-চোপড় প্রায় ভিথিরির মতো। বয়েস দশ থেকে বারোর মধ্যে, পরনের কাপড়টা এত নোঙরা যে আসলে যে ওটা লাল রঙের তা চেষ্টা ক'রে বুঝতে হয়। রোগা, বড্ড ফ্যাকাশে, কিন্তু মুখখানাতে কেমন একটা স্নান লাভণ্য।

—‘আপনি কি ডাক্তার?’

ভাবতেই পারিনি মেয়েটি আমাকে কিছু বলছে, তাই কথাটা শুনেও গ্রাহ্য করলুম না। কিন্তু পরমুহূর্তেই মেয়েটি সোজা আমারই মুখের দিকে তাকিয়ে বললে :

—‘দেখুন, আপনি কি ডাক্তার?’

খুব অবাক হলুম, একটু ঘেন খুসিও হলুম।—‘কী ক'রে বুঝলে বলো তো?’

‘ঐ বে আপনার পকেটে বুক দেখার বন্ধ। দেখুন, আমার মা-র বড়ো অসুখ, আপনি কি একবার একটু দেখে যাবেন?’

মেয়েটি এমনভাবে কথাটা বললে যেন এটা মোটেও অদ্ভুত কি অসুধারণ কিছু নয়। আমি তো কী বলবো ভেবে পাচ্ছি না। এদিকে ট্রাম এসে গেছে, একটা ট্রাম ফসকালে এই দারুন রোদ্দুরে আবার হয়তো পনেরো মিনিটের ধাক্কা।

মেয়েটি ভাঙা-ভাঙা গলায় আবার বললে : ‘চলুন না, যাবেন?’

ও-সব কথায় কান না দিয়ে ট্রামে উঠে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ হ’তো সন্দেহ নেই, কিন্তু কেমন দোটারনার মধ্যে প’ড়ে গিয়ে পা বাড়াতেই পারলুম না। ট্রামটা মোড ঘুরে আমার চোখের উপর দিয়ে ঘটরঘটব কবতে-করতে বেরিয়ে গেলো।

‘যাবেন তো?’

‘কোথায় তোমার বাড়ি?’

‘চেংলায়—এই কাছেই।’

‘কী হয়েছে তোমার মা-র?’

‘কী হয়েছে জানি না তো। বড়ো অসুখ।’

‘কদিন অসুখ?’

‘অনেকদিন। ডাক্তারবাবু, আপনি যাবেন তো?’

রান মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে আমার কেমন মায়া হ’লো, ভাবলুম, যাই না দেখে আসি ব্যাপারটা। কোনো তো কাজ নেই—না হয় নাইতে-খেতে একটু দেরি হবে।

বললুম, ‘চলো।’

‘ডাক্তারবাবু, আপনাকে আমি তো টাকা দিতে পারবো না—’ মেয়েটি আরো কী বলতে গিয়ে ঢোক গিলে থেমে গেলো।

‘আচ্ছা, আচ্ছা, সে-অন্তে ভেবো না’, আমি তাড়াতাড়ি বললুম। নতুন পাশ ক’রে বেরিয়েছি, আত্মীয়-বন্ধু মহলে ডাক-খোজ পড়ে মাঝে-মাঝে, কিন্তু ভিজিট দশটাকা যে-মাসে পাই, সে-মাসেই খুব খুঁসি। এই তো এক বছর ছেলের নিরানকুই বুঝি জ্বর হয়েছে, ট্র্যামের পয়সা খরচ ক’রে এসে তার প্রেস্ক্রিপশন লিখে দিয়ে এতক্ষণ আড্ডা মেয়ে বাড়ি ফিরছিলুম। তবু এই মেয়েটিই যা হোক টাকার কথাটা মুখে আনলে।

হেঁটে রওয়ানা হলুম মেয়েটির সঙ্গে কালীঘাট পুনের দিকে। জিজ্ঞেস করলুম, ‘তোমার মাকে আর-কোনো ডাক্তার দেখেননি?’

‘ডাক্তার? না। মা বলতেন, ডাক্তার দিয়ে কী হবে, এমনিই আমি ভালো হবো। তা ডাক্তার আমরা পাবোই বা কোথায়—টাকা তো নেই।’

‘তুমি কি আজ ডাক্তার খুঁজতেই বেরিয়েছিলে?’ জিজ্ঞেস না-ক’রে পারলুম না।

‘কতদিন হ’য়ে গেলো, একমাস গেলো, দু’মাস গেলো, মা তো ভালো হ’লেন না। জ্বর হয়, কত সময় চেঁচিয়ে ডাকলেও সাড়া দেন না—ডাক্তারবাবু, তখন আমার ভারী কান্না পায়।’

‘নাঃ, কে আর থাকবে। এক দাদা ছিল আমার, সে তো চটকলে কাজ করতে গিয়ে রেলের কাটা পড়লো। সেই থেকে আমি আর মা। বেশ তো ছিলুম আমরা—এর মধ্যে কেন অস্থখ করলো মা-র? ডাক্তারবাবু, মা কদিনে ভালো হবেন?’

আমি ডাক্তারি ধরনে হেসে বললুম, ‘সে এখন কী ক’রে বলি? চলো, দেখি তো।’

‘ডাক্তারবাবু, আজ সকাল থেকে মা যেন কেমন হ’য়ে আছেন—একবার চোখ মেলেও তাকান না। আমি দেখুন বাড়ি থেকে বেরিয়ে-

ছুটতে-ছুটতে এতদূর এসেছি, যদি কোনো ডাক্তার খুঁজে পাই, যদি আমার উপর কোনো ডাক্তার দয়া করেন। ঐ তো সব ওষুধের দোকান, ভিতরে পাংলুন-পরা ডাক্তাররা ব'সে—আমার তো সাহস হয় না ভিতরে ঢুকতে। রাস্তার এদিক থেকে ওদিক কেবলই ঘুরছি, এমন সময় আপনাকে দেখেই মনে হ'লো আপনি আমাকে দয়া করবেন। মা সেরে উঠলে আপনি একদিন এসে খাবেন আমাদের বাড়ি—কী চমৎকার লাউয়ের পাতা দিয়ে মটরডাল রান্না করেন মা—ছি-ছি, এটা কী বললুম' আপনারা কেন গরিবের বাড়িতে খেতে আসবেন—ডাক্তারবাবু, আপনার দয়া কোনোদিন ভুলবো না।'

আমি মামুলিভাবে বললুম, 'না, না, দয়া আর কী, লোকের অসুখ সারানোই তো আমাদের কাজ।' কিন্তু মনে-মনে বেশ একটু গর্ববোধ না-ক'রেও পারছিলুম না। হাজার হোক, একটা মহৎ কাজে চলেছি তা তো ঠিক।

'ডাক্তারবাবু, আপনার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে?'

'কিছু না। চলো।'

মুখে বললুম বটে, কিন্তু কালীঘাট পুল পর্যন্ত আসতে-আসতেই মনে হ'তে লাগলো এই মহৎ কাজের ভারটা না নিলেই পারতুম। এমন কত গরিব দুঃখী আছে, বিনা চিকিৎসায় ধুকতে ধুকতে মরছে, মরছে না খেয়ে—তাদের সকলের উপকার করতে গেলে নিজেরই বাঁচা দায়।

পুল থেকে নেমে বাঁ দিকের রাস্তা নিলুম।

'আর কত দূর?'

আমার প্রশ্নে নিতান্ত ব্যাকুল হ'য়ে মেয়েটি বললে, 'এই তো—আর একটুখানি। আমার পয়সা নেই, তা'হলে নিশ্চয়ই আপনাকে গাড়ি ক'রে নিতুম। ওঃ, কত কষ্ট হ'লো আপনার!'

‘বাঃ, এইটুকু রাস্তা হাঁটতে পারা না!’

এতক্ষণে আমার শরীর দিয়ে যেন আগুন ছুটছে। রুমাল বাঁধ ক’রে ঘাম মুছলুম। তক্ষুণি মনে হ’লো এই দিব্যি জোয়ান শরীর নিয়ে আমার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে, আর মেয়েটা! ঐটুকু তো মেয়ে—ছুটতে ছুটতে চলেছে আমার সঙ্গে, ওর সুবিধের জন্তু আমি তো একটু আস্তেও হাঁটছি না। কত যেন ঘুরেছে ও, হয়তো কতদিন ওর ভালো ক’রে খাওয়াও হয়নি, মা অসুখে প’ড়ে, কে খেতে দেবে। ওর একটু ক্লান্তির ভাব নেই, এই গনগনে রোদ—তাও যেন ওর গায়েই লাগছে না! আমার ভিতরটা কেমন একটু সঙ্কুচিত, লজ্জিত হ’য়ে পড়লো। কষ্ট হচ্ছে ব’লে নিজের উপর রাগ হ’লো যেন।

অনেক গলিঘুঁজি পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছলুম। কলকাতার এ অঞ্চলে কোনোদিন আর আসিনি—সত্যি বলতে, জায়গাটা ঠিক কলকাতাই নয়। একেবারেই পাড়াগাঁ। পুকুর, বনজঙ্গল, কিছু পাকা বাড়ি, কিছু বা খড়ের ঘর। একটা অতি জীর্ণ, শ্যাওলা-ধরা খ’সে-পড়া একতলা পাকা বাড়ির সামনে মেয়েটি এসে বললে, ‘এই।’

ভিতরে ঢুকে দেখি, মেয়ের উপর মলিন বিছানায় একজন স্ত্রীলোক নিঃসাড় হ’য়ে শুয়ে। চোখ তার আধো-বোজা, খানিক পর-পর নিশ্বাস পড়ছে জোরে-জোরে।

মেয়েটি তার কানের কাছে মুখ দিয়ে ডাকলে, ‘মা, মা।’

কোনো জবাব এলো না।

‘মা, মা, তোমার জন্তে ডাক্তার নিয়ে এসেছি, চেয়ে আঁখো। মা, এই ডাক্তারবাবু তোমাকে ভালো করবেন।’

চোখ দুটো একবার পলকের জন্তু খুলেই আবার বুজে এলো।

একখানা হাত, খুকি একটু গুঠবার চেষ্টা করলো, অক্ষুট একটু আওয়াজ করলো, একলো গলা দিয়ে ।

মেয়েটি বললে, 'ডাক্তারবাবু, ভালো ক'রে দেখুন, মাকে আজই ভালো ক'রে দিন ।'

কিন্তু বেশি কিছু দেখবার ছিল না । আর একটু পরেই নাভিশ্বাস শুরু হবে । তবু আমরা ডাক্তাররা সব সময়ই একবার শেষ চেষ্টা ক'রে থাকি ।

তাড়াতাড়ি বললুম, 'তুমি একটু বোসো খুকি, আমি এক্ষুনি ওষুধ নিয়ে আসছি ।'

মেয়েটি বললে, 'ডাক্তারবাবু, আপনি আবার আসবেন তো ? আমার মা ভালো হবেন তো ?'

'এক্ষুনি আসছি ওষুধ নিয়ে', বলে আমি বেরিয়ে গেলুম । ছুটতে-ছুটতে সেই কালীঘাটের পুল, তারপর, ট্রাম, ভবানীপুরে এক চেনা ডিসপেন্সারি থেকে একটা ইন্জেকশন কিনলুম, ধার ক'রে নিলুম একটা ইন্জেকশন-এর ছুঁচ । হাঁপাতে-হাঁপাতে আবার যখন গিয়ে পৌঁছলুম, ততক্ষণে ঘণ্টা দেড়েক তো নিশ্চয়ই কেটেছে ।

ফেরবার সময় রাস্তাটা বোধ হয় কিছু গোলমাল হয়েছিল, একটু ঘুর-পথে এসে সেই বাড়ির সামনে দাঁড়ালুম । রোদ্দুরে ছুটোছুটি ক'রে তখন আমি কানে পিঁ-পিঁ আওয়াজ শুনিছি । কিন্তু ডাক্তারের স্বাস্থ্যের কথা ভাববার সময় তখন নয় । ভিতরে ঢুকতে ঠিক যেন পা সরছিলো না, কে জানে গিয়ে কী দেখবো । সামনের দরজাটা হাঁ-করা খোলা তাড়াতাড়ি গিয়ে চুকলুম, কিন্তু ঢুকেই স্তম্ভিত হ'য়ে গেলুম ।

তবে কি আমি ভুল বাড়িতে এলুম ।' না, ঐ তো সেই পুকুর, সেই স্বরকির রাস্তা, ঐ ছুটো সুপুর্নিগাছ । 'দেড় ঘণ্টা আগে এই ঘরটাতেই

তো এসেছিলুম মেয়েটির সঙ্গে কিন্তু মেয়েটি কোথায়? তার মুমূর্ষু মা-ই বা কোথায় গেলো? ঘরে জিনিসপত্র অবশ্য খুব কমই ছিল, কিন্তু যে-ক'টা ছিল, সে-কটাই বা দেখছি না কেন?

অবাক হ'য়ে দেখলুম, ঘরটা একেবারে খাঁ-খাঁ খালি। শিগ'নির যে এখানে কোনো মানুষ বসবাস করেছে এমন চিহ্নও কিছু নেই। আমি এগিয়ে গেলুম, ওদিকে আর-একটা ঘর, সেটার দেয়ালে কালিঝুলি মাথা, কোণে একটা ভাঙা উতুন, বিবর্ণ একটা ঘটি প'ড়ে আছে।

তবে কি ওর মা এর মধ্যেই ম'রে গেলো, আর ও মাকে নিয়ে চ'লে গেলো কেওডাতলায়? এত অল্প সময়ের মধ্যে কী ক'রে তা হ'তে পারে? ঘরে কিছু জিনিসপত্র ছিল, একটা লঠন, দু' একটা থালা-বাটি...সেগুলো?

আস্তে-আস্তে আমি বাইরে এসে দাঁড়ালুম। তবে কি সমস্ত জিনিসটাই আমার চোখের ভুল...মনের ভুল? এই রোদ্দুরে কি আমার মাথা খারাপ হ'য়ে গেলো? এই তো আমি ঠিক দাঁড়িয়ে আমার পকেটে ইন্জেকশন, সবই ঠিক আছে। নাকি আমি পথ ভুল ক'রে ভুল বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছি?

ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে আছি, মাথার উপর যে আগুন ঝরছে সে-খেয়ালও নেই। চারদিক ছবির মতো চূপচাপ। হঠাৎ দেখি, টাক-পড়া আধা-বয়সি একটা লোক আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। কোনোখানে কেউ ছিল না, লোকটা যেন হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে উঠে এলো। তার দিকে তাকাতেই সে বললে, 'কী মশাই, বাড়িখানা কিনবেন নাকি?'

'আপনারই বাড়ি বুঝি?'

লোকটা ঠোঁট উলটিয়ে বললে, 'ইয়া-মশাই, আইনতঃ আমারই। কপালে হুতোম থাকলে ঋণাবে কে? কোথাকার এক বিধবা পিসি, জন্মে ছ'বার চোখেও দেখিনি, মশাই—সংসারে কেউ কোনোখানে নেই—আইনের প্যাচে ঘুরতে-ঘুরতে বাড়িখানা এসে পড়লো আমারই ঘাড়ে। আর বলেন কেন—এমন কপাল নিয়েও আসে মানুষ। পিসি টেসলেন ত্রিশ বছরে, কুড়ি বছরের ছেলেটা রেল কাটা পড়লো, পিসি যখন স্বগ্গে গেলেন, ভাবলুম ভালোই হ'লো। একটা মেয়ে ছিল—' হঠাৎ খেমে গিয়ে অন্তরকম সুরে লোকটা বললে, 'ও-সব লোকের কথায় কান দেবেন না মশাই, একদম বাজে কথা।'

আমি কথা বলার জগ্গে হাঁ করলুম কিন্তু আমার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরবার আগেই লোকটা বলে চললো, 'ঐ তো একফোটা বারো বছরের মেয়ে, তা মা-টা যেদিন অন্ধা পেলো, পরের দিন ও দিব্যি কড়িকাঠ থেকে ঝুলে পড়লো। একখানাই সাড়ি ছিলো পরনে, সেটা দিয়ে কস্ম সারলো। কী ডে'পো মেয়ে মশাই—থাকলে আমরা একটা বিয়ে-টিয়ে দিয়ে দিতুম, বাড়িখানা ছিলো তিনপুরুষের, একরকম চ'লে যেতো। তা লোকে যা বলে সব বাজে কথা, মশাই—ই্যাঃ, ভূত না হাতী! আপনি তো এডুকেটেড লোক, আপনিই বলুন, ও-সব কথায় কি কান দিতে আছে! নিতে চান তো খুব সস্তায় ছাড়তে পারি। সবসুদ্ধ পাঁচশো টাকা—আচ্ছা, হড়েগড়ে চারশোই দেবেন, যান। জলের দরে পাচ্ছেন, জমিটুকু তো রইলো, আপনি ইচ্ছেমত বাড়ি তৈরি ক'রে নেবেন। কী বলেন?'

অতি ক্ষীণস্বরে আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'কদিনের কথা এটা?'

'কোনটা? এই পিসির...তা ছ' বছর হবে। পিসির জগ্গে তো কোনো ভাবনা ছিল না, মশাই, মেয়েটার জগ্গে বাড়িটার এমন বদনাম

হয়েছে যে পাঁচটাকাতেও কেউ ভাড়া নেয় না। এদিকে ট্যাক্সো তো গুনতে হচ্ছে আমাকেই। কী বিপদে পড়েছি, গিলতেও পারিনে, উগরোতেও পারিনে। আমি গরিব মানুষ, আমার উপরে এ জুলুম কেন? থাকি কাঁচড়াপাড়ায়, রোজ-রোজ এসে যে তদ্বির করবো তারও উপায় নেই। আপনি নিন না বাড়িটা কিনে—আচ্ছা, কী দেবেন আপনিই বলুন...বলুন না।’

স্মাঙাতের সাক্ষাৎ

দেওঘর থেকে দূরে দেহাতের বাড়িটাই পছন্দ করলাম। চেঞ্জ গিয়ে, যদি শহরের ঘিঞ্জির মধ্যেই থাকা গেল তবে আর হাওয়া বদলানো কী? তোমরাই বলো!

বাড়িটা বেশ বড়োই, বছরের পর বছর ধরে খালিই পড়ে ছিল। পোড়ো বাড়ি নাকি!—বলছিল কে। আমার বিশ্বাস হয় না। শহরের সুখ সুবিধা ছেড়ে, এতদূরে, মাঠের মধ্যখানে, কে আর বাড়ি ভাড়া করতে আসবে বলো? সেইজন্মই ভুতুড়ে বাড়ি বলে' সুখ্যাতি রটেছে, তাছাড়া আর কি? অন্ততঃ, আমার তো তাই মনে হোলো।

আমার বেশ পছন্দই হয়েছে বাড়িটা! আমিও একা, বাড়িটাও একাকী, সন্ধ্যার মুখেই আমাদের সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়ে গেল।

দীর্ঘকালের ধুলো আর মাকড়সার জাল ভেদ করে' ঢুকলাম তো বাড়ির মধ্যে। ভূতের আশুনার মতই হয়ে আছে বটে! ঘরদোরের কেউ কোনদিন ষড় নেয় নি, এ বাড়ির যে কখনো ভাড়াটে জুটবে তা বোধহয় কারুর প্রত্যাশাও ছিল না।

টেবিল, চেয়ার, চৌকি, আয়না, দেরাজ, আলমারি, খাট, তোশক, বিছানা, পাপোশ—আসবাবের কোনো কিছুই অভাব নেই, ঘুরে ঘুরে দেখলাম। নিজেকেই ঝেড়ে মুছে নিতে হবে এ-সব। ভুতুড়ে বাড়ি বলে' কেউ আসতে চাইল না আমার সঙ্গে। মোটা বেতনের লোভ দেখিয়েও, সারা দেওঘর খুঁজে একটা চাকর যোগাড় করা গেল না।

যাক, নিজেই সব ঠিকঠাক করে' নেব ! আজ তো নয়,—সেই কাল সকালে সে-সমস্ত । এখন কেবল খাটটা ঝেড়ে-ঝুড়ে, নিজের বিছানাটা পেতে, আজকের রাত্রে মতো ব্যবস্থা করে' নিতে পারলেই হয় । •

আপত্ততঃ তাই করা গেল । কিন্তু ঘরের মেঝেতে জমে রইল বহুদিনের জড়ো-করা ধুলো । চারিধারের পুঁজি-করা ধুলোঝালি-জঞ্জালের মধ্যে খুব স্বচ্ছন্দ বোধ করছিলাম না । কিন্তু কি আর করা যাবে ? এখন রাত্রে মুখে একা একা এত পরিষ্কার করা সম্ভব নয় কিছুতেই ।

আলো জ্বাললাম । উসকে দিলাম ওর শিখাটা ।

তারপর বিছানায় গিয়ে লম্বা হলাম । অবিশ্রি, ঘুমোবার সময় হয়নি এখনো, সবে মাত্র, সন্ধ্যা উৎরেছে বলতে গেলে, তবু একটু গড়িয়ে নিতে ক্ষতি কি ?

বিছানায় গড়াতে গিয়ে কখন যে নিজার কোলে ঢুলে পড়েছি নিজেই জানিনে । হঠাৎ এক ঝটকা আওয়াজে চট করে' ভেঙে যায় আমার চটকা । বুক ধড়াসু করে' ওঠে, ধড়মড়িয়ে উঠে বসি ।

বিছানা ছেড়ে, আশু আশু ইজি চেয়ারটায় বসলাম গিয়ে !

বাতিটা দিলাম আরো উসকে ।

চারিধার নির্জন আর নিস্তরক ।

চিন্তাটাকে অন্তরিক্কে ফেরাতে চেষ্টা করলাম । যে সব দিন চলে গেছে তার মধুর স্মৃতি মনের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে চাইলাম । কত পুরোনো দৃশ্য আধভোলা মুখ, মিষ্ট কণ্ঠস্বর, কত গান যা আগে লোকের গলায় গলায় ছিল কিন্তু আজকাল কেউ গায় না! আর—যারা প্রিয়জন হতে পারত অথচ ভাব হোলো না যাদের সঙ্গে—ইত্যাদি ইত্যাদি—

আপনা থেকেই কেমন গা ছম্ ছম্ করতে থাকে ।

ঘণ্টা দুয়েক এইভাবে কাটলাম । নিঃসঙ্গতার বোধ ক্রমশই

আমাকে আচ্ছন্ন করে' এল। বাতি নিবিয়ে, আন্তে আন্তে গিয়ে বিছানায় আশ্রয় নিলাম।

এর মধ্যে কখন বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে, বাতাস সোঁ সোঁ করছে, আমি শুয়ে শুয়ে তাই শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়লাম।

হঠাৎ আমার ঘুম গেল ভেঙে; সব নীরব নিস্তরু কেবল আমার আর্ত হৃদয় বাদে,—তার গুর গুর আওয়াজ আমি স্পষ্ট শুনছিলাম। গায়ে কঞ্চল মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলাম, কঞ্চলটি আন্তে আন্তে কথা নেই বার্তা নেই, পায়ের দিকে সরে যেতে শুরু করল, কেউ সেধার থেকে টানছে যেন। আমার নড়বার চড়বার—এমন কি প্রতিবাদ করবার পর্যন্ত শক্তি রইল না। যতক্ষণ না আমার কোমর এসুক খালি হোলো কঞ্চল সরতেই থাকলেন। কি আর করি আমি? ভদ্রতা আর চলে না দেগে, টানাটানি শুরু করে' দিলাম। অনেক ধস্তাধস্তি করে' কঞ্চলকে ধরে' এনে আপাদ-মস্তক ঢেকে দিলাম আবার।

আমি কান পেতে প্রতীক্ষায় রইলাম। কী হয় দেখি! আবার কঞ্চল সরতে শুরু হোলো। এবার পা-বরাবর গিয়ে পৌঁছল। আবার তাকে পা থেকে টেনে আনলুম। এমনি করে' অপরিচিত বন্ধুর সঙ্গে আমার অদৃশ্য টাং অর্ ওআর্ চলতে থাকল। যখন তৃতীয় বার কঞ্চল সরে গেল তখন টানবার শক্তি পর্যন্ত অস্তহিত হোলো আমার। এবার কঞ্চলটা একবারেই উধাও হয়ে গেল। আমি হতাশ হয়ে অশ্রুটধ্বনি করলাম। পায়ের কাছ থেকে প্রতিধ্বনির মতো সেই সুরে প্রত্যুত্তর এল। আমার কপাল ঘেমে উঠল। মনে হোলো যা বেঁচে আছি তার চেয়ে ঢের বেশি পরিমাণে মারা গেছি নিশ্চয়।

কিছু পরেই হাতীর পায়ের মতো একটা থপ্ থপ্ শব্দ ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল—মাহুষের পায়ের শব্দ কখনই অমন হতে পারে না,

অবিশি অতি-মানুষের কথা বলতে পারিনে! থপ্ থপে আওয়াজটা দরজার দিকে এগিয়ে গেল, শুনলাম,—ছড়কো এবং দরজা না খুলেই বেরিয়ে গেল বাইরে।

মানসিক উত্তেজনা শান্ত হলে, আমি স্বগতোক্তি করলাম, এ হচ্ছে স্বপ্ন,—স্বপ্নই—ভয়ঙ্কর এক দুঃস্বপ্ন। ভাবতে চেষ্টা করছি যে, হয় এ বিভ্রম নয় শুধু স্বপ্ন, তা ছাড়া আর কিছু হওয়া সম্ভব নয় এবং ক্যামেরার সামনে লোকে যেমন করে' থাকে তেমনি হঠাৎ হাসতেও যাচ্ছি, এমন সময়ে শুনতে পেলাম, দূরে এবং নাতিদূরে, বাড়ির আর সব ঘরের দরজা জানলা জোরে খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। এও কি মতিভ্রম? আমারই?

চট করে' উঠে আলোটা জাললাম। জেলে দেগি আমার ঘরের দরজা আগের মতই বন্ধ রয়েছে, অকস্মাৎ খুলবার ও বন্ধ হবার কোন অভিসন্ধি নেই তার। তখন আরামের নিশ্বাস ফেলে, সিগারেট ধরিয়ে আমার ডেক চেয়ারটায় এসে বসলাম।

হঠাৎ একটা দৃশ্য দেখে আমার পিলে পর্যন্ত চমকে উঠল। সিগারেট খসে পড়ল মুখ থেকে। শ্বাসপ্রশ্বাসও ভারী সংক্ষিপ্ত হয়ে এল আমার! এ কি! ঘরের পুঞ্জীকৃত ধুলোর উপরে আমার পায়ের দাগের পাশাপাশি—! এ কার আবার? আরেক পায়ের দাগ, এত বড়ো যে তার তুলনায় আমার পায়ের দাগ নিতান্তই শিশুর বলে সন্দেহ হয়।

কিছু পূর্বে যে-বন্ধুটি কঞ্চল টানাটানি করে' গেছেন এ কি তাঁরই শ্রীচরণের চিহ্ন?

ভয়ে ভয়ে বিছানায় ফিরে এলাম। সঙ্গে সঙ্গে বাতিটাও আপনা থেকেই নিবে গেল। অনেকক্ষণ ধরে' অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে

কান খাড়া করে' পড়ে রইলাম। হঠাৎ মনে হোলো, কে যেন তার বিশাল বপুটি টেনে নিয়ে আসছে, কিন্তু ঘরের যে-জানালাটা খোলা ছিল সেটা নিতান্তই খাটো বলে' কিছুতে গলতে পারছে না তা'দিয়ে। আমি ক্ষীণ কণ্ঠে বল্লুম—“বন্ধু, তোমার ঐ গোদা পা নিয়ে আর এ ঘরে এসো না, বেজায় স্থানাভাব।”

কিন্তু সে' যে আমার আপত্তিতে কর্ণপাত করেছে এমন মনে হোলো না।

খানিক পরে পরে, একটা ভয়ানক গোলমাল দরজার বাইরে অবধি এসে, একটু ইতস্ততঃ করে, যেন ফিরে ফিরে যাচ্ছিল। আমার বিছানার চার পাশে ফুস্ ফুস্ গুজ্ গুজ্ শুনতে পেলাম, ভারী নিখাসের শব্দ, অদৃশ্য পাথার ঝটাপট আর কি রকম একটা গুম্‌রানো গৌঁয়ানো ধ্বনি। মহা মুস্কিলেই পড়া গেল তো! কেননা আমার পষ্ট বোধ হোলো ঘরে কারা যেন এসেছে, আর আমি নিঃসঙ্গ নই।

ঈষৎ উজ্জ্বল কি যেন একটা পড়ল বালিশে। দুফোঁটা আবার পড়ল আমার মুখে, পড়েই গলে তরল শীতলতা হয়ে মুখময় ব্যাপ্ত হয়ে গেল। তারপরেই দেখতে পেলাম আবছা আবছা মুখ, সাদা সাদা হাত যেন বাতাসে ভাসচে, এই ভেসে উঠচে এই মিলিয়ে যাচ্ছে! বুঝলাম আমার অবিলম্বে দরকার—হয় আলো নয় মৃত্যু; অবশ্য মৃত্যুর চেয়ে আলোটাই বেশি বাঞ্ছনীয়! ভয়ে অবশ হয়ে গেছে সারা দেহ, আন্তে আন্তে যেমন উঠতে গেছি, কার চ্যাপটা হাতের সঙ্গে আমার মুখের ঠোকাঠুকি বেধে গেল। এই অনাকাঙ্ক্ষিত মিলনের জন্ম আমি একেবারেই অপ্রস্তুত ছিলাম। ধড়াস্ করে' আবার বিছানায় শুয়ে পড়ি। তার খানিক বাদে বোধ হোলো একটা কাপড় চোপড়ের ধস্ ধস্ শব্দ ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

আবার সব চুপ্‌চাপ! কতকালের রোগীর মত আমি বিছানা ছেড়ে উঠলাম। কম্পিত হাতে বাঁও জ্বাললাম। আলো জ্বলে, ধুলোর পরে যে ভয়ানক সব পায়ের দাগ পড়েছে তারই গবেষণা করছি; হঠাৎ বাতি যেন নিবু নিবু হয়ে এল, সেই মুহূর্তে আবার সেই হাতীয়া পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। শব্দটা দরজার কাছাকাছি এসে যেন কিছু চিন্তা করবার অজুহাতেই চমকে খেমে গেল হঠাৎ। বাতিটা নিবু নিবু হয়ে এসে হঠাৎ কেমন নীল আলো বিকিরণ করে' নিবল কিনা জানিনা, সমস্ত ঘরটা ছায়াপথের আলোতে ভরে উঠলো।

দরজা খোলা নেই, অথচ এক ঝটকা ঠাণ্ডা বাতাস কোথা থেকে আমার গালে এসে লাগল। আমার সামনে বাষ্পময় কি একটা যেন খাড়া হয়ে রইল। দারুন অস্বস্তি বোধ করি। কিন্তু কী যে করব—!

প্রথমে একটা হাত তারপরে দুটো পা, তারপরে সমস্ত শরীরটা, মায় এক বিষন্ন বদন, ক্রমশঃ সেই বাষ্প থেকে আত্মপ্রকাশ করল। দেখলাম আমার সামনে এক প্রায়-নগ্নকায় প্রকাণ্ড দৈত্যের মত চেহারা সটান দাঁড়িয়ে রয়েছে।

লোকটার বিষন্ন মুখ দেখে আমার ভয় দূর হোলো, মনে হোলো এ কোনো ক্ষতি করবে না—ক্ষতিজনক ভূত এ নয় বোধ হয়? আমার স্বাভাবিক মনের অবস্থা ফিরে এল তখন, সঙ্গে সঙ্গে আলোও আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। আমি একলা ছিলাম, নিঃসঙ্গতার বদলে এই ভূতটাকে কাছে পাওয়া গেল—এ ভালোই। খুসিই হলাম আমি। অচেনা জায়গায় হঠাৎ আত্মীয় পাওয়ার মতোই—আর কি!

আমি তাকে অভ্যর্থনা করে' বললাম—“কে হে তুমি? তুমি কি জানো যে আমি দু তিন ঘণ্টা যাবৎ মুমূর্ষু হয়ে রয়েছি? যাক তোমাকে দেখে খুসিই হওয়া গেল! আমার যদি একটা চেয়ার থাকতো, অবশ্য

তোমাকে ধারণ কৰিব। মতো—আচ্ছা, খামে, খামো, ঐ জিনিসটিৰ
উপৰ বসে পোড়ো না বেন !”

কিন্তু কাকেই বা বলা ! ততক্ষণে অমন দামী চেয়াৰটিতে সে বসে
পড়েছে, চেয়াৰটিও সৰ্কে সৰ্কে ভেঙে গুঁড়িয়ে একেবাৰে সমাদিস্থ হৈ
গেল।

“দাড়াও দাড়াও, তুমি সবই ভাঙবে দেখ্‌চি—”

বলা বাহুল্য ! ইজিচেয়াৰটিৰও সেই দুৰ্দশা !

“তোমাৰ ঘটে কি বুদ্ধি বিবেচনা কিছুই নেই ? ঘরের সব জিনিস-
পত্ৰ ভেঙে কি তছনছ কৰতে চাও তুমি ? কৰো কি, কৰো কি,
সৰ্বনাশ—”

বলা নিষ্ফল ! তাকে বাধা দেবার আগেই সে বিছানায় গিয়ে বসে
পড়ে। বিছানাটাও চেয়াৰগুলোর সঙ্গী হোলো। কি ভয়ানক !

“এটা কি বকম ভদ্রতা হচ্ছে শুনি ?” এবাৰ দস্তুরমতো চটেই
উঠলাম আমি, “প্রথমে তো হাতীৰ মতো গোদা পায়ের শব্দে ভয়
দেখিয়ে, প্রায় মরি আর কি, সেটা না হয় সহ্য কৰা গেল, কিন্তু এখন
এসব কি হচ্ছে কী ? বায়স্কোপের পর্দাতেই এরকমের রসিকতা বৰদাস্ত
কৰা চলে, লৱেল্-হাডিৰ ছবিতেই কেবল ! তোমাৰ লজ্জা পাওয়া উচিত।
বোঝাব মত বয়েস হয়েছে তোমাৰ। নেহাৎ ছেলেমানুষটি নও তো !”

“আচ্ছা আর আমি কিছু ভাঙব না। কিন্তু কি কৰব বলা, একুশ
বছৰ ধৰেই আমি হাঁটছি, কেবল হাঁটছি, একদণ্ড কোথাও বসতে পাইনি
য্যাদিন !”

তাৰ চোখ থেকে দৰবিগলিতধাৰে অশ্রুপাত হতে থাকে। ভূতের
চোখে জল ! এ যে ৰাম-নামের মতই অভাবনীয় ব্যাপার ! বেচাৰি
ভূত ! আমাৰ ছঃখ হোলো দস্তুরমত !

আমি বললাম, আমার রাগ করা উচিত হয়নি সত্যি! তুমি যে একটি বাপমাহারা সত্যি অনাথ বালক তা কি আমি জানি? তা কি করবে, এই মাটিতেই বস,—কিছুই তোমার ভার সহবে না যে! নইলে হয়ত কোলে করেই বসতুম তোমায়। হ্যাঁ, সামনে ঐখানটাতেই! তাহলে এই চেয়ারে বসে তোমার সঙ্গে মুখোমুখি কথা কইতে পারবো।”

সে মাটিতেই বসে পড়ল। আমার দামী কঞ্চলটা সে ঘাড়ে ফেলল এবং বিছানাটাকে জড়িয়ে মাথায় পাগড়ীর মত করে বাঁধল। তখন তার আয়েশ একটা দেখবার মতো!

“ভালো কথা, এত ইঁটা ইঁটাট করছ কেন তুমি?” আমি জিজ্ঞাসা করি, “পাছে বাতে ধরে সেই ভয়ে?”

“আর কেন? খবর পেলাম কোথায় নাকি আমার স্ট্যাচু খাড়া করা হয়েছে? ইয়া লম্বা চওড়া চেহারা, এই ঠিক আমার মতোই—ঘোড়ার উপর বসানো। আমার সেই পাখুরে চেহারা দেখতেই আমি বেরিয়েছি। কিন্তু কোথায় যে রয়েছে, তাই খুঁজে পাচ্চিনা!”

“ভাবনার কথাই তো বটে।” আমি বলি, “নিজের চেহারা নিজে না দেখতে পাওয়ার মতো দুঃখ কি আছে! তা এক কাজ করনা কেন? এত না হেঁটে, একটা ঘোড়া টোড়া নিলেও তো পারো। ঘোড়ায় চেপে—”

“এক বেটা ঘোড়াকে, মানে ঘোড়ার ভৃত্যকে বহুৎ বলে’ কয়ে’ রাজিও করেছিলাম, কিন্তু শেষটায় সে বিগড়ে গেল হঠাৎ!” তার কণ্ঠস্বরে ক্ষোভ আর বিরক্তি প্রকাশ পায়: “একেবারে বেকে বসল আর বলল যে সারাজন্ম ছুটোছুটি করেই মরেছি এখন মরে গিয়েও সেই ছুটোছুটি? একটু জিরোতে পাবনা?”

“তারপর—?”

“আমি তাকে অনেক করে’ বোঝাই ; বলি যে আমার মতো তোরও স্ট্যাচু বসিয়েছে তারা, খবর পেয়েছি আমি। আমাকে কিনা, তারা, সেখানেও, তোর পিঠেই চাপিয়ে রেখেছে—! সেইজন্মেই তো তোর পিঠে চেপেই আমি যেতে চাই!—এই না যেই শোনা, ঘোড়াটা চটেমটে এমন চিঁহি চিঁহি ডাক ছাড়ে যে, ঘোড়ায় চাপার বায়না রেখে দিয়ে সোজা পদব্রজেই আমি বেরিয়ে পড়ি!”

আমি সহানুভূতি জানাই—“ভারী মুন্সিলের কথা! এত বেশি বয়সে এতখানি হাঁটাইটি কি পোষাবে তোমার? তার চেয়ে এক কাজ করলে তো পারো। রেল যাতায়াত করলেও তো পারো। তাড়াতাড়ি অনেক জায়গায় ঘোরা হয় তাতে!”

“হেঁটেই মেরে দেবো। রেল আবার কেন?”—সে আশঙ্কা প্রকাশ করে, “রেল ভারী কাটা পড়ে লোক, ভারি কলিশন্ হয়! সেই ভয়েই তো রেল চাপি না।”

“তা, চাপানো যে ভালোই করো!” ওর কথায় আমি সায় দিই। “ওতে খরচাও বাঁচে। কিন্তু একটা প্রশ্ন, কদিন তুমি এই রকম পায়চারি করছ পৃথিবীতে?”

“পৃথিবীতে? তা প্রায় একশ বছর!” সে জবাব দেয়—“পৃথিবীতে এবং পৃথিবী ছাড়িয়েও।”

“পৃথিবী ছাড়িয়েও কি রকম?” আমি অবাক হই, “অগ্ন্যন্ত গ্রহে উপগ্রহেও যাতায়াত আছে নাকি তোমার?”

“আহা! তা কি আমি বলেছি? আর, সে সব জায়গায় যাবই বা কেন? তারা কি আমার স্ট্যাচু খাড়া করেছে?”

“তবে পৃথিবী ছাড়িয়ে কি রকম?”

“যোগবলে। আকাশ-পথেও চলা ফেরা করতে পারি কিনা

আমরা। অনেক সময়ে, মাটির থেকে দুহাত, আড়াই হাত, পৌনে চারহাত পর্যন্ত ওপরে উঠি।”

“বলো কি?”

আমার মাথায় চকিতে বিজলী খেলে যায়, সেই যে কিছু দিন আগে খুব সোরগোল করে—ই্যা, ঠিক হয়েছে, ইনিই! ইনিই তবে! এ না হয়ে আর যায় না।

“ওঃ, এখন বুঝছি—” হঠাৎ আমার টনক নড়ে : “তোমার পায়ের দাগের সঙ্গে মিলে যায় ছবছব।”

“কি—কি?” কোতুহলী হয়ে ওঠে—সে।

“কিছুদিন আগে জায়গায় জায়গায় যে সব—বড়ো বড়ো পায়ের দাগ দেখতে পাওয়া গেছিল, যা-নিয়ে খবরের কাগজে কাগজে খুব হৈ চৈ পড়েছিল সেই সময়ে—এখন বুঝতে পারছি সে-সব কার কীতি!

“কার?”

“কার আবার? তোমার।”

“তা হবে। বিষয় ভাবে সে ঘাড় নাড়ে—“খবরের কাগজও দেখিনি অনেকদিন!”

“দেখাতাম তোমায়, কিন্তু রাখিনি ত! তোমার সঙ্গে দেখা হবে, জানত কে! জানলে রাখতাম।” আমি বলি,—“কিন্তু বলো দেখি, আমার বাড়িতেই পায়ের ধুলো দিলে কেন হঠাৎ?”

“তোমার আস্তানার কাছ দিয়ে এই রাস্তা দিয়েই যাচ্ছিলাম কিনা!” সে বলতে থাকে : “আর এই বাড়িটায় আলো জলছিল। তারপর খড়ি দিয়ে সদর দরজায় তোমার নিজের নাম লিখেছ দেখলাম তার সঙ্গে আমার নামের ভারি মিল! ভাবলুম আমারই আত্মীয় হয়তো, কিঞ্চি আমারই স্মাঙাত ট্যাঙাত কেউ হবে, তবে তোমার কাছ থেকেই জেনে

নিই না কেন আমার ছ্যাচুর ঠিকানা ! ষাক্, তুমি যখন জানোই না, তখন আর বসে থেকে কি লাভ ? আমার পথে আমি বেরিয়ে পড়ি আবার ।”

। “সে কথা মন্দ নয় !”

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আমি বলি : “কিন্তু—”

সে সক্রম চোখ তুলে তাকায় আমার দিকে ।

“তোমার নামটি কি তা তো বলে গেলে না ?”

“তোমার নাম ? আউট্‌রাম ।” সে বলে—“জাঁদরেস্ আউট্‌রাম ! বেঁচে থাকতে লড়াই করাই ছিল আমার কাজ । তখন জেনারেল বলে আমায় ডাকত সবাই । এ রকম অদ্ভুত নাম শুনেচ এর আগে ? অবশ্য তোমার নিজের নাম ছাড়া । আচ্ছা আসি তবে ?—কেমন ?”

আমার বাক্যস্ফুটি হবার আগেই আউট্‌রাম আউট হয়ে গেলেন । আমার লাল কস্বলটাও সঙ্গে নিয়ে গেলেন, বিছানাটাও আর ফিরিয়ে দিলেন না ।

জঙ্গল বাড়ির বৌ-রানী

অনেক দিন থেকেই সাধ, অকূল বিশাল কোন নদীর • ওপর পানসি করে কয়েকটা দিনরাত্রি খেয়াল মত শ্রোতে ভাসিয়ে কাটিয়ে দেব। অনেক দিন থেকে,—মানে 'ছিন্নপত্র' পড়া অবধি। সেই যে কয়েকটা ছেঁড়া ছেঁড়া আলগা ছবি ছেলেবেলায় চোখের ওপর ভেসে উঠেছিল, তাঁদের আলোয় স্বপ্নের মত বিছিয়ে থাকা বালুচর, মাঝ রাতে অন্ধকার কাঁপিয়ে বুনো হাঁসের পাখার শব্দ, সে আর মন থেকে কোন কিছুতেই মুছে যায়নি। সে সব মধুর নামগুলোও ভুলিনি! শিলাইদহ ত পৃথিবীর কোন জায়গা বলে মনে হয়না আমার এখনো। সে যেন কোন রূপকথার ভূগোলের নাম। আমার ছিন্নপত্রের 'পদ্মায়' ত রেলি-ব্রাদাসের পাটের স্টীমার যায় না, সে পদ্মা সাত সমুদ্র তের নদীর একটি—রূপো গলানো তার জল ঢেউ তুলে মধুকরের সপ্তডিঙাকে বড় জোর আমার মন ছেড়ে দিতে পারে দূর সিংহলে বাণিজ্যে যেতে।

ছেলেবেলার সেই সাধ হঠাৎ এবার পূরণ হয়ে গেল। একেবারে পুরোপুরি পূরণ হয়ে গেল তা বলতে পারি না, কারণ নদীটা পদ্মা নয় ধলেশ্বরী। কিন্তু তাতে এমন কিছুই আসে যায়-না। সব নদীই আশ্চর্য নদী, এপার থেকে ওপার ঝাপসা দেখলেই হোল, ফুলে উঠলেই হোল হাওয়ায় দূরের নৌকোর পাল, আর রাতের অন্ধকারে চঞ্চল জলের শ্রোতে ভেসে গেলেই হোল তারার ছায়া।

বরং আসল পদ্মায় ঠিক শিলাইদহ নামটি ধরে খোঁজ করতে গেলেই

ধাবাপ হ'ত। মনের ছবির সঙ্গে চোখের ছবির কেবল লাগত কাটাকাটি মারামারি, আমার স্বপ্ন যেত ভেঙে আর স্মৃতিও জমত না যথুর করে'।

আর আমার ধলেশ্বরীর বা অভাব কিসের। সেও ছোটখাট রণরঙ্গিনী মূর্তি হবে বর্ষার প্লাবনে ভাঙ্গন ধবায় লোকালয়ের কূলে। তারো বৃকে চর জাগে স্বপ্নেব মত, চখাচখির ডাকে তারো তুকুল কেঁদে ওঠে অঙ্ককার বাত্রে।

মাঝারি সাইজের একটি পানসি ভাড়া কবেছিলাম। মাঝি মালা চাকর বাকর নিয়ে সবশুদ্ধ আমরা ছ'জন মাত্র।

এত লোকেবও বৃষ্টি দবকাব ছিল না। বিনা তাড়া-ছড়োয় নীরে স্নানস্থ যেমন খুশি ভেসে যাওয়াই ছিল আমাদের কাজ, তাও বড বড গল্পে কি লোকালয়ের ভীড কবা ঘাটে নয, শূন্য নির্জন তীরে তীরে, শুধু পাখীর ঝাঁক বসা চড়ার ধারে ধারে। তার জন্তে একা চরণ মাঝিই যথেষ্ট। অধিকাংশ সময়েই তো আর সবাইএর ছুটি, একা চরণই বসে থাকে হালে কাঠেব মূর্তির মত। শুধু যখন মেঘনার মোহনায় গিষে পড়বার উপক্রম হল তখন শ্রোতের উজান ঠেলে যেতে দাঁড়ে হাত দিতে হয় অন্য মাঝিদেব।

'ছিন্নপত্রের' স্বপ্নের কুয়াসা মনেব গাধো না থাকলে পানসিব জীবন বেশ পানসে হয়ে উঠতে পারত। গরমিল ত কম নয। ছিন্নপত্রের পদ্মায় কচুরিপানার কুৎসিৎ জঙ্গল দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তা ছাড়া রামসেবকের রান্না থেকে চরণ মাঝির চেহারা পর্যন্ত খুঁত ধরবার অনেক কিছু ছিল। কিন্তু আমি ছিলাম ওসবের প্রায় ওপবে।

প্রায় ওপবে, এই জন্তে বলছি যে, চরণ মাঝির চেহারাটা সব সময়ে ঠিক স্বাভাবিক ভাবে বয়দাস্ত করতে পারতাম না। এক এক সময়ে

নিজের অজান্তেই বুঝি শিউরে উঠেছি। এখন মাঝরাতে আর সবাই গড়িয়ে পড়েছে পানসির খোলে, মেঘ ঢাকা চাঁদের আলোয় ধলেশ্বরী থম থম করছে, আর মিশরের মমির মত শুধু চরণ আছে বসে নিম্পন্দভাবে হালে। কামরা থেকে বেরিয়ে এসে হঠাৎ মনে হয়েছে, আবার সেখানেই ফিরে যাই। সেখান থেকে তবু অন্য মাঝীদের নিশ্বাসের শব্দ পাওয়া যায়। তাতেও কেন অনেকখানি ভরসা।

সত্যি, জ্যান্ত মানুষের এমন অদ্ভুত মরা চেহারা হতে পারে আমি আগে কখন জানতাম না। রঙ তার কালো বলে নয়, কালো ত সব মাঝিই, কিন্তু তার চামড়ায় যেন কি একটা অপার্থিব বিবর্ণতা। যেন অনেকদিন মাটির তলায় সে চাপা পড়েছিল। এই সবে উঠে এসেছে; শ্রীওলাধরা ভিজ়ে মাটি মুছে গা থেকে।

লোকটার ধরন-পারনও অদ্ভুত। কথা সে খুব কমই কয়, অত্যন্ত ভারী হাঁড়ির মত গলায় শুধু একটু আধটু হাঁ, না ছাড়া তাকে আর কিছু বলতে শুনেছি বলেও মনে পড়ে না। অন্য মাঝীদের সাথে তার মেলা মেশাও নেই। তবু সবাই যেন একটু সভয়ে তাকে সমীহ করে দূরে রেখে চলে, সে তার মরা চামড়া সত্ত্বেও দৈত্যের মত বিশাল চেহারার জন্মে।

সেদিনও মেঘে ঢাকা, ভাঙা চাঁদের মরা জ্যোৎস্নায় চারিদিক ছম ছম করছে।

সন্ধ্যা থেকেই মাঝীদের মধ্যে একটু ফিস্ ফিস্ গুন গুন শুনছিলাম। রাত একটু হতেই তার কারণটা বোঝা গেল।

একজন মাঝি সাহস করে এগিয়ে এসে, কান মাথা চুলকে, জামতা

আমতা করে জানালে যে আমি যদি তাদের একটা রাত ছুটি দিই, তাহলে তারা একটু ভালো 'যাত্রা' শুনে আসে।

• 'যাত্রা' কোথাও হচ্ছে হেসে জিজ্ঞাসা করে' জানলাম। খানিক আগে যে গঞ্জ আমরা পেরিয়ে এসেছি, সেখানেই নাকি ভাবী নামজাদা এক দল এসেছে। এমন 'যাত্রা' শোনবার ভাগ্য নাকি এ তল্লাটে সহজে মিলবে না। আমার মুখেই ভাবে ভবসা পেয়ে, সে আমাকেই সঙ্গে যাবার প্রস্তাব করে ফেলে এবার।

হেসে বললাম—না মাঝির পো, আমার অত শখ নেই। তবে তোমরা শুনে আসতে পার, ইচ্ছে হয়েছে যখন। কিন্তু গঞ্জের ঘাটে ত আমি থাকতে পারব না।

মাঝি তৎক্ষণাৎ খুশি হয়ে জানালে যে, আমায় সে কষ্ট তাবা দেবে না। এখান থেকে কতটুকু আর পথ, তারা পাড দিয়ে হেঁটেই যাবে। যাত্রা ভাঙতেই ফিরে আসবে ভোর বেলা। কিন্তু আমার ভয় করবে না ত।

হেসে বললাম—তা যদি একটু করে, মন্দ কি।

মাঝি সাহস দিয়ে জানালে—এখানে ভয়ের অবশ্য কিছু নেই। জল ঝাড়েব সময় নয়, নৌকো নোঙ্গর বাঁধা থাকবে নিরাপদ জায়গায়।

ইঠাং কেন যে জিজ্ঞাসা করলাম জানিনা—চরণ মাঝি যাচ্ছে ত তোমাদের সঙ্গে।

মাঝির মুখে, 'যাচ্ছে বই কি কর্তা' শুনে কেমন আশ্বস্ত বোধ করলাম বলেই একটু লজ্জিত হলাম।

মাঝিরা সব চলে যেতেই একেবারে পানসির কামরার ছাদে উঠে বসেছিলাম। এমন অপরূপ নির্জনতা ভোগ করার সৌভাগ্য কখন ত হয়নি। মাঝিরা সবাই চলে গেছে, হিন্দুস্থানী ঠাকুর রামসেবক পর্যন্ত

সঙ্গে গেছে ছজুকে পড়ে। দূরে কোথাও একটা দুটো নৌকোর আলো পর্যন্ত নেই, বিশাল ধলেশ্বরীর বুকে আমি একা—এ কথা ভাবতেও কেমন যেন রোমাঞ্চ হয়।

ঠিক পুলকের রোমাঞ্চ কিন্তু সেটা রইল না। রাত্রির নির্জনতা ধ্যান করতে করতে কখন বোধ হয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। উঠে দেখি, চারিদিকের দৃশ্য বেশ বদলে গিয়েছে, কিন্তু ভাঙা চাঁদ পশ্চিমের দিগন্তে ঢলে পড়ে কেমন ফ্যাকাশে হলদে হয়ে উঠেছে। সেই ফ্যাকাশে হলদে চাঁদের আলোয় কুলহীন ধলেশ্বরীর রুগ্ন মলিন চেহারাটা ভারী অস্বস্তিকর লাগল। একটা নাম-না-জানা পাখী দূর আকাশে কি রকম আতর্নাদের মত ডাক ছেড়ে উড়ে গেল। শিউরে উঠলাম একটু।

বুঝলাম এতক্ষণ এই খোলা জায়গায় শুয়ে ঘুমান উচিত হয়নি। অনেকক্ষণ হিম খেয়ে শরীরটা কেমন ম্যাঙ্কমেজে হয়ে উঠেছে, মনটাও সেই সঙ্গে।

ওপর থেকে নামতে যাচ্ছি, হঠাৎ থমকে গেলাম। এদিকে এতবড় একটা বিশাল পোড়ো বাড়ি ছিল নাকি! বাড়ি না বলে তাকে প্রাসাদই অবশ্য বলা উচিত। ফাটল ধরা বিশাল দেয়ালগুলো ছমড়ি খেয়ে পড়েও এখনো যেন আকাশ আড়াল করে আছে। বুঝলাম এতক্ষণ জ্যোৎস্নার অস্পষ্ট আলোয় এ পোড়ো প্রাসাদ কুয়াশায় মিশে ছিল, চাঁদ এখন তার পিছনে গিয়ে পড়তেই অন্ধকারের দৈত্যের মত জেগে উঠেছে। এ পোড়ো প্রাসাদ সম্বন্ধে কাল মাঝিদের কাছে খোঁজ নিতে হবে ভেবে আবার নামতে গিয়েও থামতে হ'ল।

পেছনে কি একটা বানবান করে শব্দ হ'ল যেন। সত্যি বলছি, এবার ফিরে চেয়ে গায়ে একটু কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। নিজেকে একেবারে একা বলে জানবার পর হঠাৎ পেছন ফিরে আর একটা

লোককে অপ্রত্যাশিতভাবে আবিষ্কার করলে, গায়ে কাঁটা দেওয়া অস্বাভাবিক বোধ হয় নয়।

একি চরণ! প্রায় ধরা গলায় বললাম—তুমি কখন ফিরলে। যাত্রা দেখলে না!

সে শেকল সমেত নোঙ্গরটা তুলে পানসির ওপর রেখে, গম্ভীর স্বরে বললে,—না।

কিন্তু নোঙ্গর তুললে কেন?—অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম। তার এভাবে একলা ফিরে আসাটা আমার একদম ভালো লাগছিল না।

সে সামনের দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে বললে,—দেখেছেন!

দেখিনি। কিন্তু এইবার দেখলুম। সেদিন রাত্রিশেষে অদ্ভুত অসাধারণ সব ঘটনা এক সঙ্গে ঘড়ঘড় করে এসেছে আমার জীবনে, তখনো তেমন ভালো করে বোধহয় বুঝিনি।

পাড়ের ওপর জলের একেবারে কিনারায় একটি দীর্ঘ নারী-মূর্তি ব্যাকুলভাবে আমাদের হাত নেড়ে ডাকছে।

কে-ও জানো নাকি!—প্রায় চীৎকার করে উঠলাম বিস্ময়ে উত্তেজনায়।

হাল ঘুরিয়ে নৌকা সেই পাড়ের কাছে ভিড়তে ভিড়তে চরণ শুধু নিঃশব্দে মাথা নাড়লে।

পাড়ে ভিড়তে না ভিড়তে মহিলাটি যেন পাগলের মত ঝাঁপিয়ে এসে পানসিতে উঠলেন। আমার কাছে এসে তারপর ভীত ব্যাকুল স্বরে বলেন,—আমায় বাঁচান! আমায় বাঁচান! দোহাই আপনার!

সে অবস্থায় যতদূর সম্ভব স্থির হয়ে বললাম—আমার যতদূর সাধ্য

চেষ্টা কৰিব, কিন্তু কি ব্যাপার! আমাৰ আগে একটু জানা দৰকাৰ। আপনি আমাৰ সঙ্গে কামৰায় চলুন।

আঁচল ঢাকা দিয়ে কি যেন একটা ভারী জিনিস তিনি বয়ে এনেছিলেন। কামৰায় চৌকাঠেৰ কাছে সেইটোৰ ভাৱে একটু হোঁচট খেতে, ভদ্ৰতা কৰে বলতাম—ওটা বড্ড ভারী বোধ হয়। আমাৰ হাতে দিতে পাৰেন।

তিনি এ কথায় এমন আঁতকে উঠে পিছু হটে দাঁড়াবেন জানলে নিশ্চয়ই ওকথা বলতাম না। তাই একটু বিমূঢ় ভাবেই নিজের কামৰায় ঢুকে লঠনটা আৰ একটু উজ্জল কৰে দিলাম।

নিজের ব্যবহাৰে তিনিও বোধ হয় লজ্জিত হয়েছিলেন। ঘৰে ঢুকে আঁচলের আড়াল থেকে একটু অদ্ভুত আকাৰের বাক্স বার কৰে, আমাৰ সামনে ৰেখে তিনি বললেন,—আমায় মাপ কৰবেন। আপনাকে অবিশ্বাস কৰা আমাৰ উচিত হয়নি। কিন্তু ভয়ে ভয়ে এমন হয়ে গেছি!

মহিলাটিকে কামৰায় আলায় এতক্ষণে ভালো কৰে দেখিছি। চেহাৰায় তাঁর স্পষ্ট বড় ঘরের ছাপ, কিন্তু কথাবাতী ধরন-ধারন যেমন তাঁর অদ্ভুত, তেমনি অদ্ভুত তাঁর পোষাক। বাই হোক তখন সে সব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নয়। তাঁর কথাৰ উত্তরে জিজ্ঞাসা কৰলাম—ভয়টা কিসেৰ? কি আছে ওতে?

তিনি কথা না বলে শুধু বাক্সেৰ ডালাটা এবাৰ তুলে ধরলেন। লঠনের সেই সামান্য আলোতেই বাক্সেৰ ভেতৰ কুণ্ডলিপাকান একরাশ সাপেৰ চোখ যেন জলে উঠল। চমকে গেলাম। মাপ নয়—হীৰা মুক্তোৰ জড়োয়া গয়না! তেমন গয়না আমি ত কখন দেখিনি।

মহিলাটি মুঠো কৰে কয়েকটা গহনা বাক্স থেকে তুলে কামৰায়

মেঝের ছড়িয়ে দিলেন। আমি নিজের অনিচ্ছাতেই একটু শিউরে
সরে বসলাম। সেগুলো যেন জড় বস্তু নয়, জীবন্ত ক্রুর সন্ন্যাস!

দরজায় খুঁট করে একটু শব্দ হতে মুখ তুলে দেখি চরণ, কখন সেখানে
নিঃশব্দে ছায়ার মত এসে দাঁড়িয়েছে। তার কোটরে ঢোকা চোখেও
যেন সাপের মত হিংস্র লোভের বিলিক।

পলক না ফেলতেই সে সরে গেল। ভয় পেয়ে একটু বিরক্তির
স্বরে বললাম,—তুলে ফেলুন এ সব বাসে। এসব সাংঘাতিক জিনিস
নিয়ে আপনি কি বলে এই রাত্রে একা বেবিয়েছেন!

আমার দিকে অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে গয়নাগুলি বাসে তুলতে তুলতে
তিনি বললেন,—বেকুব না? ওরা যে এ সব ছিনিয়ে নিতে চায়।

ওরা কারা?

আমার শশুর বাড়ির জাতিরা। আমার স্বামী বিদেশে। ওদের
এখন এই গয়নাগুলোর ওপর অসীম লোভ। ওরা সব করতে পারে
এগুলোর জন্তে—খুন করতে পারে! কিন্তু আমি দেব না, কিছুতেই
দেব না। রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে তাই আমি পালিয়ে
এসেছি।

কিন্তু আপনি যাবেন কোথায়?

যাব বাপের বাড়ি। ওরা আমার দিন রাত আগলে রাখে, যেতে
দেয় না। দোহাট্ট আপনার! হু' ক্রোশ মাত্র গেলে আমার বাপের
বাড়ি। আমায় সেখানে পৌঁছে দিন!

আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি ব্যবস্থা করছি,—বলে আমি কামরা
থেকে চরণকে আদেশ দেবার জন্তে বেরলাম।

কিন্তু আশ্চর্য! চরণ যেন আগে থাকতেই জানে। সে হালে
বসে আছে। নৌকা চলছে।

বললাম—ক্রোশ দু'য়েক বাদে নৌকো খামিরে খবর নিও ।

নিশ্চলভাবে বসে সে যেন কি একটা অস্পষ্ট জবাব দিলে অত্যন্ত বিস্মী একটা অস্বস্তি নিয়ে আবার কামরায় ঢুকে বললাম—আমি বাইরে যাচ্ছি, আপনি এ কামরার ভেতর থেকে দরজা দিয়ে দিন ।

তিনি ব্যাকুল ভাবে বললেন,—না, না, সে আরো ভয় করবে । আপনি আমার সঙ্গে থাকুন ।

উত্তরে কিছু বলবার আগেই টলে গিয়ে চমকে উঠলাম । একি ! নৌকো হঠাৎ ঘুরে গেল কেন ! চরণ মাঝি হাল ছেড়ে দিয়েছে নাকি ! পানসি নিজের খেয়ালে ঘুরছে !

টাল সামলে উঠেই বুঝলাম, আমার আশঙ্কা মিথো নয় । ডুবে যাওয়া তাঁদের শেষ ক্ষীণ আলোয় দেখলাম, ঠিক যমদূতের মত চরণ এসে কামরার দরজায় দাঁড়িয়েছে । কি হিংস্র লোভ তার অমানুষিক চোখে ও মুখে ! বুকের রক্ত হিম হয়ে যায় সেদিকে তাকালে !

অপরিচিতা মহিলা আতঙ্কে চীৎকার করে বাঁকটি সজোরে বুকে আঁকড়ে ধরে উঠে দাঁড়ালেন ! ছুটে বেরিয়ে এলেন বুঝি আমার কাছে সাহায্যের আশায় । কিন্তু বৃথা । আমি বাধা দিতে যেতেই সবল হাতের একটি মুষ্টিতে মাথা ঘুরে সজোরে পড়ে গেলাম কাঠের মেঝের ওপরে । মাথায় চোট খেয়ে তখন আমার কি রকম একটা আচ্ছন্ন অভিভূত অবস্থা । চোখের সামনে যা ঘটছে, তা দেখতে পেলোও, আমার যেন উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, গলার স্বর পর্যন্ত রুদ্ধ হয়ে গেছে ।

মহিলা প্রাণপণে তাঁর মহামূল্য বাঁকটি রক্ষা করিবার চেষ্টা করছেন । কিন্তু স্ত্রীলোক হয়ে সে দৈত্যের সঙ্গে তিনি পারবেন কি করে ।

ধীরে ধীরে বাঁকটি কায়দা করে নিয়ে, চরণ তাঁকে নৌকার ধারে

ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি টলছেন একেবারে জলের কিনারায়। দারুন হতাশায় শেষ শক্তি সংগ্রহ করে তিনি প্রচণ্ড একটা টান দিয়ে বাস্তবিক জলে পড়ে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হুমুস।

এতক্ষণে একসঙ্গে গলার স্বর আর দেহের সাড়া পেয়ে আমি চীৎকার করে ছুটে গেলাম পানসির ধারে। মহামূল্য বোঝায় ভারি সেই বাস্তবিক টানে হুজনেই তলিয়ে যাচ্ছে নদীর অতলে—কেউ তবু ছাড়বে না তার দখল।

সাঁতার জানি না, মহিলাটির সাহায্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে ও কিছু করতে পারব না। আমি আবার চীৎকার করে উঠলাম। যদি কোথাও কেউ থাকে, তাই সাহায্যের আশায়।

চাঁদ ডুবে গিয়ে ভোরের প্রথম নীলচে আলোয় তখন নদীর কুয়াশা তরল হয়ে যাচ্ছে। কটা ইলিশ মাছের ডিঙি বুঝি কাছেই ছিল। চীৎকার শুনে তারা কাছে এসে ভিড়ল। ব্যাকুলভাবে এক নিশ্বাসে তাদের যথা সম্ভব সমস্ত ঘটনা জানিয়ে যেখানে তাদের হুজনে ডুবেছে সে জায়গাটা দেখালাম।

তারা প্রথম গম্ভীর হয়ে শুনে শেষে হেসে উঠল। হেসে জানালে যে এরকম আজগুবি ব্যাপার হতেই পারে না। যত ভারী জিনিসই হোক, একেবারে গায়ে বাঁধা না থাকলে কাউকে একটানে ডুবিয়ে নিতে পারে না। তাও দু-দুটো লোককে। হাতে ধরে কাড়াকাড়ি করতে করতে ডুবলে, হুঁজন না হোক, একজন ভেসে উঠতই। আর তা ছাড়া হুকোশ কেন, এদিক ওদিক বিশ ক্রোশের ভেতর প্রাসাদের মত কোন পোড়োবাড়ি নদীর ধারে নেই। দামী গয়নার বাস্তু সমেত ও রকম মেয়েলোক আসবে কোথা থেকে!

আমি রেগে উঠে বললাম—তবে কি আমি মিথ্যে বলছি।

বৃদ্ধ গোছের এক মাঝি একটি ডিঙির এক কোণে বসে এতক্ষণ নীরবে তামাক খেতে খেতে আমার কথা শুনছিল। তারা কিছু বলবার আগেই সে এগিয়ে এসে শাস্ত স্বরে বললে—না বাবু, আপনি মিথ্যে বলেন নি, আমি জানি। আপনি জঙ্গল বাড়ির বৌ-রানীকে দেখেছেন।

তার সমর্থনে একটু ভরসা পেয়ে বললাম—জঙ্গলবাড়ির বৌ-রানী! তুমি জান তাহলে! কোথায় জঙ্গলবাড়ি বলত!

খানিক চুপ করে থেকে নীচে জলের দিকে আঙুল দেখিয়ে সে হঠাৎ বললে—ওইখানে বাবু। আজ পঞ্চাশ বছর হ'ল জঙ্গলবাড়িকে নদী টেনে নিয়েছে। তবে বৌ-রানী তাঁর জালা ভোলেন নি। এগনো মাঝে মাঝে কারো কারো পানসিতে এসে ওঠেন।

* * *

জলেরাই আমার পানসি তারপর তীরে পৌঁছে দেয়। মাঝিমাল্লারা যাত্রা থেকে ফিরে, ব্যাকুল হয়ে তখন আমায় খুঁজছে। তাদের কাছে জানলাম, চরণ মাঝি তাদের সঙ্গেই ছিল সারারাত যাত্রার আসরে।

বুঝলাম সব না হয় স্বপ্ন! কিন্তু আমার পানসির নোঙ্গর কে তুললে!

পানসির ভাড়া চুকিয়ে পরের দিনই কলকাতায় ফিরেছি। কাজ নেই আমার পানসি-বিহার। আমি ছিন্নপত্রই পড়ব।

বাদশাহী গল্প

বাদশাবাবু^৬ বললেন—“দাদামশা, ভূতপত্নীর দেশ দেখা শেষ করে কোথায় গেলেন ?”

—“গেলেম একটা জায়গায় !”

—“কিসে গেলেন ? পাঙ্কিতে ?”

—“না !”

—“রেল গাড়িতে ?”

—“না !”

—“পায়ে হেঁটে ?”

—“না !”

—“ইস্টিমারে ? মটোরে ? উডোজাহাজে ?”

—না ?”

—“তবে ?”

—“শোন বলি—

‘জলপথ, স্থলপথ, আকাশপথ—এইতো তিনটা

জলেতে চলি সাঁতার কাটি

খলেতে চলি ধবে লাঠি

আকাশ পথে স্বপ্নে হাঁটি

তবু ছাড়েনা বিপদ আপদ সঙ্গে লেগে আছেই

—কোথাও একটা খাবার চিন্তা !’

কোথায় যাই, কিসে যাই—এই ভাবছি সারা দিনটা !”

—“একটা কাঠের ঘোড়া কিনে বেরিয়ে পড়লে না কেন দাদামশা ?”
কিন্মা মশার পিঠে চড়ে ?”

—“গিয়েছিলেম মশার পিঠে চাপতে ; সেটা বললে-

‘তোমার ঐ গজগিরি দেহ গুরুভার

সাধ্য নাই বহা ক্ষুদ্র মশার

কিন্মা যুদ্ধ ঘোড়ার

জল-পী-পী কাঠের ঘোড়া তো কোন্ ছার !’

গেলেম আলিপূরের চিড়িয়াখানায় । সেখানে উটপাখীকে বললেম’—

—‘আমাকে একবার ঘুরিয়ে আনতে পারো ?’

সে বললে—‘রোজ তিন মণ করে লোহার পিরেক যদি খাওয়াতে
পারো তো রাজি আছি !’

সোনার সঙ্গে সমান দরে বিকোচ্ছে বাজারে লোহা জেনে উটপাখীর
আশা ছাড়লেম । উট বললে—‘যদি আলু-কাবলি আর আলুবোখারা
খাওয়াতে পারো সাড়ে বত্রিশ সের করে দুবেলা, তো এসো নয় তো
যাও’ বলে ডাঙার জাহাজ—সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো । বন মানুষটা
নিচের ঠোঁট উন্টিয়ে আমাকে ভেংচে দিলে । হাতি গজদাত বার
করে হেলে হলে হাসতে থাকলো—নীরব হাসি !

জানোয়ারদের খোসামোদ করতে ঘেন্না ধরলো । তখন মনের দুঃখে
ঘরে এসে নিজের চৌকিতে একটু জিরোতে বসলেম,—ছারপোকার
ভয়ে পুরোনো আসনখানা পেতে ।”

—“এইবার বুঝেছি, দাদামশা ছারপোকার পিঠে চড়ে চললে !”

—“ঠিক ধরেছ, বাদশাবাবু, এতক্ষণে ঠিক ধরেছ ! বার হলেম
ছারপোকার পিঠে—‘আমুন বমুন’ লেখা আসন পেতে ।”

—“তখন কি হল?”

—“এই মনে হচ্ছে ভাসছি জলে

এই বোধ হচ্ছে যাচ্ছি থলে

—গ্রাম হতে গ্রামান্তরে :

পরেই মনে হচ্ছে—গরু গাধা ছাগল ভেড়া হাঁস মুর্গি

তাদের সঙ্গে চড়ছি, আবার উড়ছি একসুরে ।

বন হতে বনান্তরে—দিক হতে দিগন্তরে ।

পথের পন্থি এমনি বোধ করছি যেন—

মাছরাঙা হয়ে মাছ গিলছি—হঠাৎ কাঁটা বেধেছে গলে !

অমনি “অবাক” বলে, আসন ফেলে দিয়েছি এক লাফ—চৌকি
ছেড়ে !”

—‘এরে দাদামশায়কে চারপোকা কামড়িয়েছে !

—“আরে না ভাই না, হাসি না—শোননা বলি—

জ্বগে দেখি অন্ধকারে ভূনেশ্বরের মাঠে চকাচোঁও লেগে দাঁড়িয়ে
গেছি ! চেয়ে দেখছি—

আঁধার পরে চাঁদের কলা

কতক কালো কতক ধলা ।

উত্তরে উঁচা দক্ষিণে কাৎ

মেঘ একখানা বিরাট

—কোন দেশ হতে আসছে, কোথায় যাচ্ছে কিছু যায়না বলা ।

শুষ্টিঘর একটা তারি তলায়

তেলকালি পড়া বেজায়

সেটার চূড়ায় পেটা লোহার ভূয়ুণ্ডি কাক

—এক পা তুলে বুড়োমানুষকে দেখাচ্ছে কলা ।”

—“গুস্তিঘর কারে বলে দাদামহাশয় ?”

—“কে জানে ভাই দেখে মনে হলো সেটা গুস্তিঘর ।

‘কে জানে ভূতখানা কি গুস্তিঘর

ধাঁচাখানা

থাঁচাপানা

কোন লুপ্ত যুগের গুপ্ত কৃষ্টির দিচ্ছে খবর

বারন্দা দিচ্ছে গাঙ্কার শিল্পের গন্ধ

মৌর্য শিল্পের শৌর্য বোঝাচ্ছে

সারি সারি জানালা দরজা আঁটসাঁট বন্ধ ।

অলিন্দে বারেক্স শিল্পের সারি সারি কবন্ধ

মাথার জন্তে অপেক্ষা করছে একটানা

সদর দোরে পাল রাজাদের পান্নি আছে পড়ে একখানা ।’

—কোথায় এলেম কিছু ঠিক নাই

মনে ভাবছি আগাই না পিছাই ।

এমন সময় নাক কাটা দুই মূর্তি এসে হাজির । খোনা খোনা নাকি
স্বরে বলে—‘এই যে অবু কবু, নমস্কার । কেমন আছেন ?’

বলেই দুজনে গীত ধরলেন—

‘ভালো আছেন তো ? ভালো আছেন তো ?

দেখছি কাহিল নিতাস্ত ,

মন প্রাণ তো—আছে শাস্ত ?

চিন্তে পারছেন তো ?

উপদেব উপাধ্যায়, প্রভূত সামন্ত

ভূতখানার কিউরেটার ও তাঁ আসিস্টাস্ত !’

দেখি একটা কিছু জবাব না দিলে অশিষ্টতা হয়, বললেন—‘ভালো

আর কি ? যেতে যেতে রয়ে গেছি । প্রায় হয়েছে প্রাণান্ত ; কই মশাইদের স্বরণ হয়না তো !’

—‘কি আশ্চর্য ! কত কালের ফেনশিপ্,
একদম মেমারি স্লিপ্ ?

আমরা কিছু ধরেছি ঠিক । আপনি অবনীবাবু না হয়ে যান না !
শিল্প-প্রাণ শিল্পিপ্রেদান শিল্পাচার্য আমরা আপনার—‘বলেই দুই প্রভূতে
দুই হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো ।

আমি ভাবছি যাচ্ছি কি যাচ্ছি না । তারা বলছে—‘চলেন চলেন,
চলেন, দেখবেন চলেন—আমাদের ভূখানার অদ্ভুত কলেকসন্টো !’

প্রভূত বললেন—

‘ভূখানাটি ভূনেখরের পরগণার
ভূভারতের অধুনালুপ্ত কৃষ্টির রত্ন সমষ্টির
বলেও চলে একটি বিশেষ রত্নভাগার ।’

উপদেব বললেন—

‘এখান থেকে দেখেন ধাঁচাখানা বাড়িটার
সত্যি বলেন, কেমন লাগছে আপনার ?’

আমি আর কি বলি ! মুখে এলো—‘ভূতগত ব্যাপার’ সামলে
বললাম, ‘চমৎকার !

চৌকোস যেন লখিন্দরের মাঞ্জামটা লোহার
গম্বুজটি যেন মাহেঞ্জোদাড়োর তিজেল হাঁড়ি
তোরণ মকরটি যেন পোড়া মৎস্যটি নলরাজার !’

—বলেন তো পরিকল্পনাটি কার

দেখি ভাস্কর্য সঙ্কে ভূয়োদর্শন কতদূর এগিয়েছে আপনার ?’

আমি তখন ভূয়োদর্শন করব কি, চক্ষে অঙ্ককার দেখছি ।

একবার মনে হলো বলে ফেলি—‘ধীমান বিটপালংএর ।’ কিন্তু কি জানি করে কপাল ঠুকে বললেম—‘শ্যাম মিস্তিরীর কাছোড়িয়ার !’

উপদেব একটুখানি হেসে বললেন, নিজের বুকে আঙ্গুল ঠেকিয়ে—
‘আমার !’

প্রভূত বললেন—‘চলেন, ভিতরটা দেখেন একবার !’•

খট করে একটা তাল খোলার শব্দ হলো । কালচিটে নিবিড়াকার ভেদ করে, ভিতরে ঢুকে দেখি, ফিকে ফিকে তিমির সঞ্চার ! ডাইনে বাঁয়ে ভূঁখানার দুই মহাপ্রভূতে লিষ্টি ধরে দেখিয়ে চললেন । আমিও দেখে চললেম ।

—‘শেষু নাগবংশীদের সিন্—ভারলাগ্ ওস্টাইরিন হতে সংগ্রহ করা !’

—‘কালিদাসের ঘোঁটন কালির একটুকরো !’

আমি বললেম—‘বর্ণচ্ছটায় কোক্কে হারায় । কোথায় পেলেন এটি ?’

—‘নিউ কাস্—পাঁচ নম্বর জেটি,

কয়লার দরে পাওয়া গেছে—এ রত্নটি !’

—‘দেখেন, সগরাশমেধের ঘোড়ার আঙ্কেল দাঁত

সিলোনে পাওয়া মাটির তলায়—পাঁচহাত !’

আমি বললেম—‘এটা কি ? যেন গুলে পোড়া শীতল পাটি !’

—‘আঙ্কে না, নটী বেহলার মেথুলা সাটি !’

—‘ওটা কি, শাঁখ ভাঙা নাকি ?’

—‘লখিন্দরের মালাই চাকি !’

—‘কি একটা গজালের মতন ?’

—‘লৌহদস্ত মুনির দাঁতন !’

—‘এটা বুঝি কাগের পালক ?’

—‘আঙ্কে না, আলেকজাণ্ডারের বিউকিফেলার ঘোড়ার চক্ষের পালক !’

—‘কটি কাঁচ পোকাকর ডানা না?’

—‘আহা দেখে পায় কারা—লক্ষণসেনের পেলেট্. ভাঙা।’

—‘এটা যে দেখি ভাঙা বোতল!’

—‘আজ্ঞে না মশায়, সম্রাট অশোকের গড়গড়ার মুখনল!’

—‘ও যে পড়লো, একটা কাগজের চিরকুট!’

—‘আহা, উপগুপ্তের প্রেমপত্রের কোন একটুক
করকোটি ভাষায় লেখা—শুভে দেখেন,

লোধ রেগুর গন্ধ পাবেন—অত্যন্ত খুব।’

—‘দেখেন, অজ্ঞাটা গুহার দোরের ছিটকিন্!’

—‘যেন আজকালের একটি চেপ্টপিন্!’

—‘পাহাড়পুরের কাঁচা ইঁট এক খান!’

—‘মহেঞ্জোদাড়োর ব্যাঞ্জোর কান।’

—‘এটা বুঝি নারদ মুনির পিয়োনোর তার?’

—‘অদ্ভুত শিল্পদৃষ্টি আপনার!’

—‘লম্বা আঙ্গুল দেখেই বুঝেছি।’

—‘বাইরে পড়ে ওটা কি?’

—‘মৈপাল রাজার সুখপাল পালকি!’

—‘তা হলে আমি ওটাতেই উঠি, আর কি?—নমস্কার!’

—‘বড়ই চললেন তাড়াতাড়ি

দেখান হলোনা চাঁদ সদাগরের হেঁতাল বাড়ি

নেতা ধোপানীর পাট

বড় চণ্ডীদাসের দোয়াত

বাংলার কৃষ্টি সবই গেল বাদ

—‘দেখলে হতো কাজ ভারি!’

আমি বললাম—‘পরে আসবো যদি সময় করতে পারি !’

—‘ষে রূপ দিন কাল পড়েছে মশায়, দেখেন বল্লালসেনের ব্রাহ্মণ-
ভোজনের খুরি গেলাস মেটে হাঁড়ি !’

—‘তা হলে ষাই এখন সুখপালে হই কাং !’

—‘তা হলে ষাই এখন সুখপালে হই কাং !’

—‘প্রণিপাৎ দণ্ডবাৎ—একটা দিয়ে যান অটোগ্রাফ !’

পকেট খুঁজতে গিয়ে দেখি, পকেটও নেই, সোয়ান কলমও নেই,
কামিজটাও লোপাট !

জেগে দেখি হঠাৎ হয়ে গেছি— ঠাকুর শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ।”

নিশা অভিযান

খস্—স্—বালুর চরে নৌকা বাধিয়াছে। ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিলাম। এই যে এ-পারে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। কিন্তু এ কোন্ জায়গা? বাড়ি আমাদের কত দূরে? বালুকার রাশি ভিন্ন আর কিছুই ত কোথাও দেখি না? প্রশ্ন করিবার পূর্বেই হঠাৎ নিকটেই কোথায় যেন কুকুরের কলহ শুনিতে পাইয়া আরও সোজা হইয়া বসিলাম। কাছেই লোকালয় আছে নিশ্চয়।

ইন্দ্র কহিল, একটু ব'স্ শ্রীকান্ত; আমি এখুনি ফিরে আসব—
তোমার কিছু ভয় নেই! এই পাড়ার ওদ্বারেই জেলেদের বাড়ি।

সাহসের এতগুলো পরীক্ষায় পাশ করিয়া শেষে এইখানে আসিয়া ফেল করিবার ইচ্ছা ছিল না। বিশেষতঃ মানুষের এই কিশোর বয়সটার মত এমন মহাবিশ্ময়কর বস্তু বোধ করি সংসারে আর নাই। তখন সঙ্গীর কাছে ভীকু বলিয়া কে নিজেকে প্রতিপন্ন করিতে চাহে? অতএব তৎক্ষণাৎ জবাব দিলাম, ভয় করব আবার কিসের? বেশ ত যাও না। ইন্দ্র আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া দ্রুতপদে নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

উপরে মাথার উপর আবার সেই আলো আধারের লুকোচুরি খেলা এবং পশ্চাতে বহুদূরগত সেই অবিভ্রান্ত তর্জন। আর স্মৃখে সেই বালির পাড়। এটা কোন্ জায়গা, তাই ভাবিতেছি, দেখি ইন্দ্র ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। কহিল, শ্রীকান্ত তোকে একটা কথা বলতে

ফিরে এলুম। যদি কেউ মাছ চাইতে আসে, খবরদার দিস্ নে—
খবরদার ব'লে দিচ্ছি। ঠিক আমার মত হয়েও যদি কেউ আসে, তবু
দিবি নে—বলবি, মুখে তোরা ছাই দেব—ইচ্ছে হয়, নিজে তুলে নিয়ে
যা। খবরদার হাতে ক'রে দিতে যাস নে যেন—ঠিক আমি হলেও
না, খবরদার!

কেন ভাই?

ফিরে এসে বলব—খবরদার কিন্তু, বলিতে বলিতে সে যেমন
ছুটিয়া আসিয়াছিল, তেমনি ছুটিয়া দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল।

এইবার আমার পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত কাটা দিয়া
খাড়া হইয়া উঠিল। বোধ হইতে লাগিল, যেন দেহের প্রতি শিরা
উপশিরা দিয়া বরফ জল বহিয়া চলিতে লাগিল। নিতান্ত শিশুটি
নহি যে তাহার ইঙ্গিতের মর্ম অনুমান করিতে পারি নাই! আমার
জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটয়া গিয়াছে যাহার তুলনায় ইহা সমুদ্রের
কাছে গোপ্পদের জল। কিন্তু তথাপি এই নিশা-অভিযানের রাতটায়
যে ভয় অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। বোধ
করি ভয়ে চৈতন্য হারাইবার ঠিক শেষ ধাপটিতে আসিয়াই পা দিয়া-
ছিলাম। প্রতি মুহূর্তেই মনে হইতেছিল পাহাড়ের ওদিক হইতে কে
যেন উকি মারিয়া দেখিতেছে! যেমনি আড়চোখে চাই তেমনি সেও
যেন মাথা নিচু করে।

সময় আর কাটে না। ইন্দ্র যেন কত যুগ চলিয়া গিয়াছে—
আর ফিরিতেছে না।

মনে হইল, যেন মানুষের কণ্ঠস্বর শুনিলাম। পৈতেটা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে
শত-পাকে বেষ্টন করিয়া মুখ নিচু করিয়া উৎকর্ণ হইয়া বসিলাম।
কণ্ঠস্বরে ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইলেন বেশ বুঝিলাম, দুই-তিনজন লোক

কথাবার্তা বলিতে বলিতে এই দিকে আসিতেছে। একজন ইন্দ্র এবং আর দুইজন হিন্দুস্থানি। কিন্তু সে যাহা হোক, তাহাদের মুখের দিকে চাহিবার আগে ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম চন্দ্রালোকে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে কি না! কারণ এই অবিসংবাদী সত্যটা ছেলোবেলা হইতেই জানিতাম যে ইহাদের ছায়া থাকে না।

আঃ—এ যে ছায়া! অস্পষ্ট হউক, তবুও ছায়া! জগতে আমার মত সেদিন কোন মানুষ কোন বস্তু চোখে দেখিয়া কি এমন তৃপ্তি পাইয়াছে! পাক আর নাই পাক ইহাকেই যে বলে দৃষ্টির চরম আনন্দ, এ কথা আজ আমি বাজি রাখিয়া বলিতে পারি। যাক! যাহারা আসিল তাহারা অসাধারণ ক্ষিপ্ততার সহিত সেই বৃহদায়তন মাছগুলি নৌকা হইতে তুলিয়া জানের মত একপ্রকার বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া ফেলিল এবং তৎপরিবর্তে ইন্দ্রের হাতে যাহা গুঁজিয়া দিল, তাহার একটা টুং করিয়া একটুখানি মৃদু মধুর শব্দ করিয়া নিজেদের পরিচয়টাও আমার কাছে সম্পূর্ণ গোপন করিয়া গেল না।

ইন্দ্র নৌকা খুলিয়া দিল, কিন্তু শ্রোতে ভাসাইল না। ধার ঘেঁষিয়া প্রবাহের প্রতিকূলে লগি ঠেলিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল।

আমি কোন কথা কহিলাম না। কারণ আমার মন তখন তাহার বিরুদ্ধে ঘূণায় ও কি-একপ্রকারের অভিমানে নিবিড়ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এইমাত্র না তাহাকেই টাদের আলোয় ছায়া ফেলিয়া ফিরিতে দেখিয়া অধীর-আনন্দে ছুটিয়া গিয়া জড়াইয়া ধরিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিলাম!

ইন্দ্র কথা কহিল, জিজ্ঞাসা করিল, তুই একটুও ভয় পাস নি, না রে

?

আমি সংক্ষেপে জবাব দিলাম, না—

ইন্দ্র কহিল, কিন্তু তুই ছাড়া আর ওখানে কেউ বসে থাকতে পারত না তা জানিস্? তোকে আমি খুব ভালবাসি—আমার এমন বন্ধু আর একটিও নেই। আমি যখন আসব, তোকে শুধু ডেকে আনব, কেমন?

আমি জবাব দিলাম না। কিন্তু এই সময় তাহার মুখের উপর সঙ্গী মেঘমুক্ত যে চাঁদের আলোকটুকু পড়িল, তাহাতে মুগ্ধখানি কি যে দেখাইল, আমি এতক্ষণের সব রাগ-অভিমান হঠাৎ ভুলিয়া গেলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা ইন্দ্র, তুমি কখনও ঐ সব দেখেচো?

কি সব?

ঐ যারা মাছ চাইতে আসে?

না ভাই দেখি নি—লোকে বলে, তাই শুনেচি।

আচ্ছা, তুমি এখানে একলা আসতে পার।

ইন্দ্র হাসিল। কহিল, আমি ত একলাই আসি।

ভয় করে না?

না। রামনাম করি। কিছুতে তারা আসতে পারে না। একটু খামিয়া কহিল, রামনাম করা কি সোজা রে? তুই যদি করতে করতে সাপের মুখ দিয়ে চলে যাস, তবু তোর কিছু হবে না। সব দেখবি ভয়ে ভয়ে পথ ছেড়ে পালাবে। কিন্তু ভয় করলে হবে না। তা হলেই তারা টের পাবে, এ শুধু চালাকি করচে—তারা সব অন্তর্ধর্মী কি না।

বালুর চর শেষ হইয়া আবার কাকরের পাড় শুরু হইল। ওপার অপেক্ষা এপারে স্রোত অনেক কম। বরঞ্চ এইখানটায় বোধ হইল স্রোত যেন উর্নটামুখে চলিয়াছে। ইন্দ্র লগি তুলিয়া বোট হাত করিয়া কহিল, ওই যে সামনে বনের মত দেখাচ্ছে, আমাদের ওর ভেতর দিয়ে যেতে হবে। ওইখানে আমি একবার নেমে যাব। যাব আর আসব, কেমন।

অনিচ্ছা-সত্ত্বেও বলিলাম, আচ্ছা। কারণ না বলিবার পথ ত এক-প্রকার নিজেই বন্ধ করিয়া দিয়াছি। এবার ইন্দ্রও আমার নির্ভীকতা সম্বন্ধে বোধ করি নিশ্চিত হইয়াছে। কিন্তু কথাটা আমার ভাল লাগিল না। এখান হইতে ওই স্থানটা এমনি জঙ্গলের মত অন্ধকার দেখাইতে-ছিল যে, এই মাত্র রামনামের অসাধারণ মাহাত্ম্য শ্রবণ করা সত্ত্বেও ওই অন্ধকার প্রাচীন বটবৃক্ষমূলে নৌকার উপর একা বসিয়া এত রাতে রামনামের শক্তি-সামর্থ্য যাচাই করিয়া লইতে আমার এতটুকু প্রবৃত্তি হইল না, এবং তখন হইতে গা ছম্ ছম্ করিতে লাগিল। সত্যি বটে, মাছ আর ছিল না, সুতরাং মংসপ্রার্থীদের শুভাগমন না হইতে পারে : কিন্তু সকলের লোভ যে মাছেরই উপর, তাই বা কে বলিল? মানুষের ঘাড় মটুকাইয়া ঈষদৃষ্ণ রক্তপান ও মাংস চর্বনের ইতিহাস ত শোনা গিয়াছে!

অনুকূল স্রোত এবং বোটের তাড়নায় ডিঙিখানি তর্ তর্ করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল। আরও কিছুদূর আসিতেই দক্ষিণ-দিকের আগ্রীবমগ্ন বনঝাউ এবং কসাডবন মাথা তুলিয়া এই দুইটি অসমসাহসী মানবশিশুর পানে বিশ্বয়স্কভাবে চাহিয়া রহিল এবং কেহ বা মাঝে মাঝে শিরশ্চালনে কি যেন নিষেধ জানাইতে লাগিল। বাম-দিকেও তাহাদেরই আত্মীয়-পরিজনেরা সু-উচ্চ কঁাকরের পাড় সমাচ্ছন্ন করিয়া তেমনি করিয়াই চাহিয়া রহিল এবং তেমনি করিয়া মানা করিতে লাগিল। আমি একা হইলে নিশ্চয় তাহাদের সঙ্কেত অমান্য করিতাম না। কিন্তু কর্ণধার যিনি, তাঁহার কাছে বোধ করি এক রামনামের জোরেই ইহাদের সমস্ত আবেদন-নিবেদন একবারেই ব্যর্থ হইয়া গেল। সে কোনদিকে দ্রক্ষেপই করিল না। দক্ষিণদিকের চরের বিস্তৃতি-বশতঃ এ ষায়গাঁটা একটি ছোট-খাটো হ্রদের মত হইয়াছিল—শুধু উত্তরদিকের

মুখ খোলা ছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা ভিড়ি বেঁধে উপরে ওঠবার ত ঘাট নেই, তুমি যাবে কি করে ?

ইন্দ্র কহিল, ওই যে বটগাছ : ওর পাশেতেই একটা সরু ঘাট আছে।

কিছুক্ষণ হইতে কেমন একটা দুর্গন্ধ মাঝে মাঝে হাওয়ার সঙ্গে নাকে আসিয়া লাগিতেছিল যত অগ্রসর হইতেছিলাম, ততই সেটা বাড়িতেছিল। এখন হঠাৎ একটা দমকা বাতাসের সঙ্গে সে দুর্গন্ধটা এমন বিকট হইয়া নাকে লাগিল যে অসহ্য বোধ হইল। নাকে কাপড় চাপা দিয়া বলিলাম, নিশ্চয় কি পচেছে ইন্দ্র।

ইন্দ্র বলিল, মড়া। আজকাল ভয়ানক কলেরা হচ্ছে কি না। সবাই ত পোড়াতে পারে না—একটুখানি আগুন ছুঁইয়ে ফেলে দিয়ে যায় শিয়াল কুকুরে খায় আর পচে। তারই অত গন্ধ।

কোনখানে ফেলে দিয়ে যায় ভাই ?

ওই হোথা থেকে হেথা পর্যন্ত—সবটাই শ্মশান কি না। যেখানে হোক ফেলে রেখে ওই বটতলার ঘাটে চান ক'রে বাড়ি চ'লে—আর দূর। ভয় কি রে ! ও শিয়ালে শিয়ালে লড়াই করচে। আচ্ছা, আয়, আয়, আমার কাছে এসে ব'স।

আমার গলা দিয়ে স্বর ফুটিল না—কোনমতে হামাগুড়ি দিয়া তাহার কোলের কাছে গিয়া বসিয়া পড়িলাম। সে ক্ষণকালের জন্য আমাকে একবার স্পর্শ করিয়া হাসিয়া কহিল, ভয় কি শ্রীকান্ত ? কত রাক্তিরে একা আমি এই পথে যাই আসি—তিনবার রামনাম করলে কার সাধি কাছে আসে ?

তাহাকে স্পর্শ করিয়া দেহটাতে যেন একটু সাড়া পাইলাম—অশ্রুটে কহিলাম, না ভাই, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, এখানে কোথাও নেবো না—সোজা বেরিয়ে চল।

সে আবার আমার কাঁধে হাত ঠেকাইয়া বলিল, না শ্রীকান্ত, একটি-বার যেতেই হবে। এই টাকা কটি না দিলেই নয়—তারা পথ চেয়ে বসে আছে—আমি তিনদিন আসতে পারিনি।

টাকা কাল দিয়ো না ভাই!

না ভাই, অমন কথাটি বলিস নে। আমার সঙ্গে তুইও চল, কিন্তু কারুকে এ কথা বলিস নে যেন।

আমি অক্ষুটে 'না' বলিয়া তাহাকে তেমনি স্পর্শ করিয়া, পাথরের মত বসিয়া রহিলাম। গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু হাত বাড়াইয়া জল লইব, কি নড়া-চড়ার কোন প্রকার চেষ্টা করিব, এ সাধ্যই আমার আর ছিল না।

গাছের ছায়ার মধ্যে আসিয়া পড়ায়, অদূরেই সেই ঘাটটি চোখে পড়িল। যেখানে আমাদের অবতরণ করিতে হইবে, তাহার উপরে যে গাছপালা নাই, স্থানটি স্নান জ্যোৎস্নালোকেও বেশ আলোকিত হইয়া আছে; দেখিয়া অত দুঃখেও একটু আরাম বোধ করিলাম। ঘাটের কাঁকরে ডিডি ধাক্কা না খায়, এই জন্য ইন্দ্র পূর্বাঙ্কুশেই প্রস্তুত হইয়া মুখের কাছে সরিয়া আসিল এবং লাগিতে না লাগিতে লাফাইয়া পড়িয়াই একটা ভয়ঙ্করিত স্বরে 'ইস' করিয়া উঠিল। আমিও তাহার পশ্চাতে ছিলাম, স্তরাং উভয়ে প্রায় এক সময়েই সেই বস্তুটির উপর দৃষ্টিপাত করিলাম। তবে সে নীচে, আমি নৌকার উপরে।

অকাল-মৃত্যু বোধ করি আর কখনও তেমন করুণ ভাবে আমার চোখে পড়ে নাই! ইহা যে কত বড় হৃদয়ভেদী ব্যথার আধার, তাহা তেমন করিয়া না দেখিলে বোধ করি দেখাই হয় না। গভীর নিশীথে চারিদিক নিবিড় স্তব্ধতায় পরিপূর্ণ। শুধু মাঝে মাঝে কোপ-ঝাড়ের অন্তরালে শ্মশানভারী শৃগালের ক্ষুধার্ত কলহ চীৎকার, কখন বা বৃক্ষোপবিষ্ট

অধঃস্থ বৃহৎকায় পক্ষীর পক্ষতাড়ন শব্দ, আর বহুদূরগত তীব্র জলপ্রবাহের অবিশ্রাম হ-হ-হ আতর্নাদ—ইহার মধ্যে দাঁড়াইয়া উভয়েই নির্বাক, নিস্তব্ধ হইয়া এই মহাকরণ দৃশ্যটির পানে চাহিয়া রহিলাম। একটি গৌরবর্ণ ছয়-সাত বৎসরের স্তম্ভপুষ্ট বালক—তাহার সর্বাঙ্গ জল ভাসিতেছে, শুধু মাথাটি ঘাটের উপর। শৃগালেরা বোধ করি, জল হইতে তাহাকে এইমাত্র তুলিতেছি, শুধু আমাদের আকস্মিক আগমনে নিকটে কোথাও গিয়া অপেক্ষা করিয়া আছে! খুব সম্ভব তিন-চারি ঘণ্টার অধিক তাহার মৃত্যু হয় নাই। ঠিক যেন বিস্মৃচিকার নিদারুণ যাতনা ভোগ করিয়া সে বেচারী মা-গঙ্গার কোলের উপরেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। মা অতি সন্তর্পণে তাহার স্কুমার নখর দেহটিকে এইমাত্র কোল হইতে বিছানায় শোয়াইয়া দিতেছিল। জলে-স্থলে বিগ্নস্ত এমনি ভাবেই সেই ঘুমন্ত শিশু-দেহটির উপর সেদিন আমাদের চোখ পড়িয়াছিল।

মুখ তুলিয়া দেখি, ইন্দের দুই চোখ বাহিয়া বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা ঝরিয়া পড়িতেছে। সে কহিল, তুই একটু সরে দাঁড়া শ্রীকান্ত, আমি এ-বেচারাকে ডিড়িতে তুলে ঐ চড়ার ঝাউবনের মধ্যে জলে রেখে আসি।

চোখের জল দেখিবামাত্র আমার চোখেও জল আসিতেছিল সত্য। কিন্তু এই ছোয়া-ছুঁয়ির প্রস্তাবে আমি একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলাম। পরদুঃখে ব্যথা পাইয়া চোখের জল ফেলা সহজ নহে, তাহা অস্বীকার করি না; কিন্তু তাই বলিয়া সে দুঃখের মধ্যে নিজের দুই হাত বাড়াইয়া আপনাকে জড়িত করিতে যাওয়া সে ঢের ঢের কঠিন কাজ! তখন ছোট-বড় কত জায়গাতেই না টান ধরে। একে ত এই পৃথিবীর সেরা সনাতন হিন্দুর ঘরে ষশিষ্ঠ ইত্যাদির পবিত্র পূজ্য রক্তের

বংশধর হইয়া জন্মিয়া, জন্মগত সংস্কারবশতঃ মৃতদেহ স্পর্শ করাকেই একটা ভীষণ কঠিন ব্যাপার বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছি, ইহাতেই কতই না শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের বাঁধা-বাঁধি, কতই না রকমারি কাণ্ডের ঘট। জাহাতে এ কোন্ রোগের মড়া, কাহার ছেলে, কি জাত—কিছুই না জানিয়া এবং মুরিবার পর এ ছোকরা ঠিক মত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়াছিল কিনা, সে খবরটা পর্যন্ত না লইয়াই বা ইহাকে স্পর্শ করা যায় কিরূপে ?

কুণ্ঠিত হইয়া যাই জিজ্ঞাসা করিলাম, কি জাতের মড়া—তুমি ছোবে ?

ইন্দ্র সরিয়া আসিয়া এক হাত তাহার ঘাড়ের এবং অন্য হাত হাঁটুর নীচে দিয়া একটা শুষ্ক তৃণখণ্ডের মত স্বচ্ছন্দে তুলিয়া লইয়া কহিল, নইলে বেচারাকে শিয়ালে ছেঁড়া-ছিঁড়ি করে থাকে। আহা! মুখে এখনো এর গুণ্ধের গন্ধ পর্যন্ত রয়েছে রে! বলিয়া নৌকার যে তক্তাখানির উপর ইতিপূর্বে আমি শুইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহারই উপর শোয়াইয়া নৌকা ঠেলিয়া দিয়া নিজেও চড়িয়া বসিল। কহিল, মড়ার কি জাত থাকে রে ?

আমি তর্ক করিলাম, কেন থাকবে না ?

ইন্দ্র কহিল, আরে এ যে মড়া। মড়ার আবার জাত কি ? এই যেমন আমাদের ডিঙিটা—এর কি জাত আছে ? আমগাছ জামগাছ যে কাঠেরই তৈরি হোক—এখন ডিঙি ছাড়া একে কেউ বলবে না। আমগাছ জামগাছ—বুঝি না ? এও তেমনি।

চড়ার উপর আসিয়া অর্ধনগ্ন বন-ঝাড়ুয়ের অন্ধকারের মধ্যে জলের উপর সেই অপরিচিত শিশু-দেহটিকে ইন্দ্র যখন অপূর্ব মমতার সহিত রাখিয়া দিল, তখন রাত্রি আর বড় বাকি নাই। কিছুক্ষণ ধরিয়া সে সেই শবের পানে মাথা বুঁকাইয়া থাকিয়া অবশেষে যখন মুখ তুলিয়া

চাহিল, তখন অশ্রুট চন্দ্রালোকে তাহার মুখের যতটুকু দেখা গেল, তাহাতে অত্যন্ত ম্লান এবং উৎকর্ণ হইয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিলে যেরূপ দেখায়, তাহার শুকমুখে ঠিক সেই ভাব প্রকাশ পাইল।

আমি বলিলাম, ইন্দ্র, এইবার চল।

ইন্দ্র অন্তমনস্কভাবে কহিল, কোথায় ?

এই যে বললে, কোথায় যাবে ?

থাক--আজ আর না।

আমি খুসি হইয়া কহিলাম, বেশ, তাই ভাল ভাই—চল বাড়ি যাই।

প্রত্যুত্তরে ইন্দ্র আমার মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, ইং রে শ্রীকান্ত, মরলে মানুষ কি হয়, তুই জানিস্ ?

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, না ভাই জানি নে ; তুমি বাড়ি চল। তারা সব স্বর্গে যায় ভাই ! তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমাকে বাড়ি রেখে এস।

ইন্দ্র যেন কর্ণপাতই করিল না। কহিল, সবাই ত স্বর্গে যেতে পায় না। তা ছাড়া খানিকক্ষণ সবাইকে এখানে থাকতে হয়। দ্বাখ, আমি যখন ওকে জলের উপর শুইয়ে দিচ্ছিলুম, তখন সে চুপি চুপি স্পষ্ট বললে, ভেইয়া ! আমি কম্পিতকণ্ঠে কাদ কাদ হইয়া বলিয়া উঠিলাম, কেন ভয় দেখাচ্ছ ভাই, আমি অজ্ঞান হয়ে যাব। ইন্দ্র কথা কহিল না, অভয় দিল না, ধীরে ধীরে বোটে হাতে করিয়া নৌকা ঝাউবন হইতে বাহির করিয়া ফেলিল এবং সোজা বাহিতে লাগিল ! মিনিট-দুই নিঃশব্দে থাকিয়া গম্ভীর মৃদুস্বরে কহিল, শ্রীকান্ত, মনে মনে রামনাম কর, নৌকা ছেড়ে যায় নি—আমার পেছনেই ব'সে আছে !

তারপরে সেইখানেই মুখ গুঁজিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়াছিলাম। আর আমার মনে নাই। যখন চোখ চাহিলাম তখন অঙ্ককার নাই—নৌকা কিনারায় লাগান। ইন্দ্র আমার পায়ের কাছে বসিয়াছিল; কহিল, এইটুকু হেঁটে যেতে হবে শ্রীকান্ত, উঠে ব'স।

পিঠে-পার্বণে চীনে ভূত

রাধামাধব গুপ্ত তাঁহার মাতুলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। মাতুল ব্রহ্মদেশে কোন স্থানের ডাক্তার ছিলেন। অশ্বচিকিৎসায় তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। লোকের হাত পা কাটিয়া তিনি অনেক টাকা উপার্জন করিয়াছেন। সে টাকা তিনি খরচ করেন নাই, সঞ্চয় করিয়াছেন। সে জন্ত তাঁহাকে এক জন ধনবান্ লোক বলিলেও বলিতে পারা যায়। বৃদ্ধ-বয়সে কর্ম পরিত্যাগ করিয়া তিনি দেশে আসিয়াছেন।

মাতুল মাতুলানীকে তিনি প্রণাম করিলেন। রাধামাধবকে তাঁহারা অনেক আদর করিলেন। নানারূপ সুখাচরণ আয়োজন করিয়া মাতুলানী তাঁহাকে ভোজন করাইলেন। এইরূপে একদিন, দুই দিন, তিন দিন কাটিয়া গেল। রাধামাধব দেখিলেন সে তাঁহার মাতুল-মাতুলানী দুই জনেরই শরীর সুস্থ নহে। দুই জনেরই শরীর শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, মুখে যেন কালি মাড়িয়া দিয়াছে। দুই জনেই সর্বদা অতি বিমর্ষভাবে থাকেন। মনে যেন সর্বদাই কিরূপ একটা ভয়—কিরূপ একটা দুশ্চিন্তা। রাধামাধব আরও দেখিলেন যে, তাঁহার মাতুলের মস্তকটি মুণ্ডিত, তাঁহার মাথায় চুল নাই। তিনি মাতুলকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“বর্মায় আপনি যে স্থানে ছিলেন, সে স্থানের জল বায়ু কি ভাল ছিল না? আপনারা দুই জনেই অতিশয় শীর্ণ হইয়া গিয়াছেন। দেখিলে বোধ হয়, যেন আপনাদের শরীরে কোন একটা রোগ আছে।”

মাতুল উত্তর করিলেন,—“না, আমাদের শরীরে কোন রোগ নাই।”

এইরূপে উত্তর দিয়া তিনি সে কথা চাপা দিতে চেষ্টা করিলেন। রাধামাধব সে সম্বন্ধে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করেন, ইহাই যেন তাঁহার ইচ্ছা। সে জন্ম রাধামাধব আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। কিন্তু তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহার মামা-মামীর শরীরে রোগ না থাকুক, মনে কোনরূপ রোগ হইয়াছে। কোনরূপ একটা ভয় অথবা দুর্ভাবনায় তাঁহাদের শরীর এরূপ শীর্ণ ও মলিন হইয়া গিয়াছে।

পরদিন মামা জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কেমন রাধামাধব! তুমি যে স্থানে ডাক্তারি কর, সে স্থানে দু’পয়সা হয় তো?”

রাধামাধব উত্তর করিলেন,—“প্রথম প্রথম বেশ দু’পয়সা হইত। তাহার পর কোথা হইতে সে স্থানে এক অবতার আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই অবধি আমার আর বড় কিছু হয় না।”

মাতুল জিজ্ঞাসা করিলেন,—“অবতার কিরূপ?”

রাধামাধব উত্তর করিলেন,—“গেকুয়া কাপড় পরা একটা লোক। সেও চিকিৎসা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। রোগীকে কখন ডাক্তারি, কখনও হোমিওপ্যাথি, কখন কবিরাজি, কখন হাকিমি, কখন স্বপ্নলব্ধ ভৌতিক ঔষধ প্রদান করে। নানা ভাবে পা রাখিয়া নানা ভঙ্গি করিয়া সে বসিতে জানে। রোগীর নিকট বসিয়া ইঙ্গলা পিঙ্গলা নাড়ী, কুণ্ডলিনী প্রভৃতি নানা গল্প করে। সে বলে যে,—‘আমি ভূত নামাইতে পারি, মৃত ব্যক্তির আত্মাকে ডাকিতে পারি। যে পর্যন্ত এই অবতারটি সে স্থানে আসিয়াছে, সেই অবধি আমার পসার প্রতিপত্তি একেবারে গিয়াছে।’”

মাতুল জিজ্ঞাসা করিলেন,—“সে লোকটি ভূত-প্রেত সম্বন্ধে যে সমুদয় গল্প করে, তাহা কি মিথ্যা?”

রাধামাধব উত্তর করিলেন,—“সমুদয় মিথ্যা । ভূত আবার কোথায় ? ভূত বলিয়া জগতে কোনরূপ বস্তু নাই ।”

মাতুল বলিলেন,—“বটে ! যদি দেখিতে পাও ?”

রাধামাধব উত্তর করিলেন,—“এ বিষয়ে আমি নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহি । মৃত ব্যক্তির আত্মাকে আহ্বান করা সম্বন্ধে ইংরেজিতে যত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, সে সমুদয় আমি পাঠ করিয়াছি । যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া আত্মাকে আহ্বান করিতে হয়, বন্ধু-বান্ধবের সহিত তাহা করিয়া আমি অনেক দেখিয়াছি । যেখানে ভূত আছে বলিয়া শুনিয়াছি, একেলা নির্ভয়ে সে স্থানে রাত্রিযাপন করিয়াছি । ভূত দেখিবার নিমিত্ত রাত্রিকালে একেলা শ্মশানে-মশানে অনেক ঘুরিয়াছি । এক দিন দুই দিন নয়, তিন বৎসর কাল এরূপ চেষ্টা করিয়াছি । কিন্তু ভূতের চিহ্নমাত্রও আমি দেখিতে পাই নাই । ভূতের গল্প সব অলীক । ভূত বলিয়া জগতে কিছুই নাই ।”

মাতুল বলিলেন,—“যদি প্রত্যক্ষ তোমাকে দেখাইতে পারি ?”

রাধামাধব উত্তর করিলেন,—“তাহা হইলে আপনার নিকট আমি চিরঞ্জী হইয়া থাকিব । পরকালের প্রতি আমার বিশ্বাস নাই । যদি ভূত দেখিতে পাই, তাহা হইলে পরকাল সম্বন্ধে আমার মনের সন্দেহ দূর হয় ।”

মাতুল বলিলেন,—“না, তুমি ছেলে মানুষ, তাই ওরূপ কথা বলিতেছ । কাজ নাই, শেষে একটা বিপদ ঘটবে ।”

রাধামাধব মাতুলকে জোর করিয়া ধরিলেন । তিনি বলিলেন যে,—“যদি ষথার্থ-ই আপনি আমাকে ভূত দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে দেখাইতেই হইবে । আমি আপনাকে কিছুতেই ছাড়িব না । আপনার কোন ভয় নাই । আমার মন রতিমাত্রও বিচলিত হইবে না ।”

মামা-ভাগিনেয়তে যখন এইরূপ কথাবার্তা হইতেছিল, তখন রাত্রি দশটা ব্যঞ্জিয়া গিয়াছিল। মাতুল যখন দেখিলেন যে, রাধামাধব তাঁহাকে কিছুতেই ছাড়িবেন না, তখন তিনি বলিলেন,—“তবে আমার সঙ্গে এস।”

রাধামাধবকে লইয়া মাতুল বড় একটা ঘরের দ্বারে গিয়া তালা খুলিলেন। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া রাধামাধব দেখিলেন যে, দেয়ালের গায়ে দুই দিকে কাঠের আলমারি আছে। সেই আলমারিতে দুই স্তর কাঠের সেল্ফ আছে, আর তাহার উপর অনেকগুলি ছোট বড় শিশি রহিয়াছে। কোন শিশিতে মানুষের পা, কোনটিতে চক্ষু, কোনটিতে পাথুরি, কোনটিতে অস্থি, মনুষ্যদেহের নানারূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রহিয়াছে।

মাতুল বলিলেন,—“এ আমার বাই। আমি নিজহাতে যত কিছু কাটিয়াছি-কুটিয়াছি, তাহা আমি স্পিরিটে রাখিয়া দিয়াছি। ইহা অপেক্ষা আরও অনেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিল। আমার বাড়িতে একবার আগুন লাগিয়া তাহার অধিকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।”

ঘরের পার্শ্বে একখানি কোচ ছিল। মাতুল বলিলেন,—“এই কোচের উপর তোমায় আমি বিছানা করিয়া দিতেছি। এই ঘরে একেলা শুইতে পারিবে? আমি একটি ল্যাম্প আনিয়া দিতেছি। ল্যাম্প জলিতে থাকুক, অঙ্ককারে থাকিয়া কাজ নাই।”

রাধামাধব উত্তর করিলেন,—“স্বচ্ছন্দে আমি এই ঘরে একেলা শুইয়া থাকিব। অঙ্ককার করিলেও আমার ভয় হইবে না।”

মাতুল বলিলেন,—“বেশ কথা! তুমি কিছু দেখিবে কি না দেখিবে, সে কথা এখন তোমাকে বলিব না। এখন বলিলে পূর্ব হইতে তোমার মনে একটা সংস্কার জন্মিয়া যাইবে।”

মাতুল নিজ হাতে কোচের উপর বিছানা করিয়া দিলেন। ঘরের পার্শ্বে ছোট একটি টেবল ছিল। সেই টেবলের উপর ল্যাম্প রাখিয়া তিনি বলিলেন,—রাধামাধব! এখন আমি চলিলাম। পাশের ঘরেই আমি শয়ন করি। রাত্ৰিতে আমার নিদ্রা হয় না। আবশ্যক হইলে তুমি আমাকে ডাকিবে, আমি তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হইব।”

মাতুল প্রশ্ন করিলে, রাধামাধব ঘরের দ্বার উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া দিলেন। তাহার পর ঘরের অন্ত্যান্ত দ্বার-জানালা ভালরূপ বন্ধ আছে কি না, তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। অবশেষে ল্যাম্পের আলোক কমাইয়া দিলেন। ল্যাম্প মিট মিট করিয়া জ্বলিতে লাগিল। কিন্তু ঘরের সকল বস্তু স্পষ্টভাবে দেখা যাইতে লাগিল।

আজ সমস্ত রাত্ৰি জাগিয়া কাটাইব, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া কোচের উপর রাধামাধব শয়ন করিলেন। কিন্তু এক ঘণ্টা পরেই তিনি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। কতক্ষণ নিদ্রা গিয়াছিল, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। সহসা তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। ঘরের ভিতর ঠক্ ঠক্ শব্দ হইতেছিল। সেই দিকে তিনি চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন যে, আলমারির ধারে ধারে এক জন পুরুষমানুষ বেড়াইতেছে। নিজ হাতে রাধামাধব ঘরের দ্বার-জানালা বন্ধ করিয়াছিলেন। বাহির হইতে ঘরের ভিতর লোক আসিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

“এ মানুষ নহে—এ ভূত”—রাধামাধবের মনে নিশ্চয় এইরূপ বিশ্বাস হইল, ভয়ে প্রাণের ভিতর তাঁহার গুরু গুরু করিয়া উঠিল। সর্বশরীর লোমাঞ্চ হইল। চিৎকার করিয়া ফেলেন আর কি।—এমন সময় মনকে দৃঢ় করিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—“পৃথিবীতে ভূত নাই, থাকিলেও তাহাকে আমি ভয় করি না। চিরকাল লোকের নিকট আমি এইরূপ মুখে শাপট করিয়াছি। আজ যদি ভয় বিহ্বল

হইয়া চিৎকার করিয়া বেশি, তাহা হইলে সকলের নিকট আমি হস্তাস্পদ হইব। অতএব প্রাণ থাকে আর যায়, কিছুতেই আমি চিৎকার করিব না।”

রাধামাধব এইরূপ মনকে আশ্বাস দিয়া, ভূত কি কবে, চূপ করিয়া তাহা তিনি দেখিতে লাগিলেন।

আলমারির উপর যে সমুদয় শিশি সাজান ছিল, ভূত একে একে সেই সমুদয় শিশি অতি মনোযোগেব সহিত নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল। কোন শিশিটি বা হাতে করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়াও দেখিতে লাগিল। ঘরের অপর পার্শ্ব হইতে শিশি দেখিতে দেখিতে ভূত রাধামাধবের দিকে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিছু নিকটবর্তী হইলে রাধামাধব দেখিলেন যে, ভূতটির মাথা নেড়া। আবও একটু নিকটে আসিলে তিনি দেখিলেন যে, তাহার পশ্চাৎ দিকে লম্বা বেণী ঝুলিতেছে। বিহুনি দেখিয়া রাধামাধব ভাবিলেন যে,—“এঃ। এটা দেশী ভূত নহে, চীনে ভূত।” অর্থাৎ কি না কলিকাতায় যাহারা জুতা গড়ে ও সূত্রধরের কাজ করে, সেই চীন দেশের লোকের ভূত। আবও একটু নিকটে আসিলে তাহার পাণ্ডুবর্ণ মুখ দেখিয়া, রাধামাধবের মনে নিশ্চয় প্রতীতি হইল যে, সে চীনে ভূত বটে। তাহার পোশাকও সেইরূপ ছিল। নিম্নদেহ নীলবর্ণের টিলা-টিলা ইজের দ্বারা ও উর্ধ্বদেহে সেই বর্ণের টিলা-টিলা ঘুন্টিওয়ানো জামার দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল।

আলমারির ধারে ধারে ঘরের দুই দিক ঘুরিয়া ভূত একে একে সমুদয় শিশিগুলি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল। যখন সমুদয় শিশি দেখা হইয়া গেল, তখন সে ঘোর দুঃখসূচক এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল, তাহার মুখ বিবর্ণ হইল, তাহার চক্ষু দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতে লাগিল। তাহার পর কোচের নিকট আসিয়া রাধামাধবের সম্মুখে

দাঁড়াইল ও অতিশয় স্তম্ভমনে আপনার হাত দুইটি তুলিয়া যেন কি দেখাইল। হাত দুইটি নহে, দেড়টি হাত। রাধামাধব দেখিলেন যে, তাহার দক্ষিণ হাতের আধখানি আছে। জামার আন্তিন কেবল কোমুই পর্যন্ত উঠিল। অবশিষ্ট ভাগ তুলিয়া পড়িল; কারণ, তাহার ভিতর হাত ছিল না। ভয়ে রাধামাধব অচেতনপ্রায় হইলেন। তাঁহার সর্বশরীর ঘর্মে সিক্ত হইয়া গেল। চিৎকার করিয়া ফেলেন, 'আর কি!— এমন সময় ভূত অদৃশ্য হইয়া গেল।

মৃতদেহেব গ্ৰায় রাধামাধব কিছুক্ষণের নিমিত্ত পড়িয়া রহিলেন। তাহার পব ক্রমে ক্রমে তাঁহার মনে সাহসের সঞ্চার হইল। প্রথমে তিনি ঘর হইতে পলায়ন কবিবাব মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে ইচ্ছা এখন তিনি পরিত্যাগ করিলেন। আরও কি হয়, তাহা দেখিবাব নিমিত্ত চূপ করিয়া তিনি শুইয়া রহিলেন। কিন্তু সে রাত্রিতে আর কোন উপদ্রব হইল না।

প্রভাত হইলে রাধামাধব উঠিয়া, পুনর্বার ঘরের দ্বার জানালাগুলি পরীক্ষা কবিয়া দেখিলেন। দেখিলেন যে, দ্বার-জানালা যে ভাবে তিনি বন্ধ কবিয়াছিলেন, সেই ভাবেই আছে। তাঁহাকে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত বাহিব হইতে যে কেহ আসিবে, সে উপায় ছিল না। ক্রমে মাতুলের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মাতুল বলিলেন,—“রাত্রিতে তুমি যে কিছু দেখিয়াছ, তোমার মুখ দেখিয়া তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি। তোমার মাতুলানীর ও আমার ইহাই রোগ; ইহার জন্মই আমাদের শরীর শীর্ণ হইয়া যাইতেছে ও দিন দিন আমাদের আয়ুক্ষয় হইতেছে। ইহার জন্মই শীঘ্র আমরা মৃত্যুমুখে পতিত হইব। যাহা হউক, ইহার সবিশেষে বিবরণ আজ দিনের বেলা তোমাকে আমি প্রদান করিব।”

সেই দিন আহাের পর যামা-ভাগিনের এক স্থানে বসিয়া গল্পগাছা করিতে লাগিলেন। সেই সময় মাতুল বলিলেন,—“বর্মার যে স্থানে আমি কাজ করিতাম, সে স্থানের হাসপাতাল আমার অধীনে ছিল। নিয়মদসূ ডাক্তারগণ বৃহৎ বৃহৎ অস্ত্রচিকিৎসা করিতে বড় সুবিধা পান না, কিন্তু এই হাসপাতালে আমার সে সুবিধা ছিল। অঙ্গচ্ছেদনাদি অনেক বড় বড় অস্ত্রচিকিৎসা আমি করিয়াছি। কোন লোকের অঙ্গচ্ছেদন করিয়া, সেই কর্তিত অঙ্গটি স্পিরিটপূর্ণ শিশির ভিতর রাখা আমার বাই ছিল। যে ঘরে গত রাত্রিতে তুমি শয়ন করিয়াছিলে, সেই ঘরে সেইরূপ অনেকগুলি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে। বর্মা চীনের নিকট, চীনদেশের অনেক লোক এ দেশে বাস করিয়াছে। এক দিন এক জন চীনেয়ান আমার হাসপাতালে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি দেখিলাম যে, তাহার দক্ষিণ হাতটির কোনোই পর্যন্ত পচিয়া গিয়াছে। আমি তাহাকে বলিলাম যে,—‘হাতটি কাটিয়া না ফেলিলে কিছুতেই তোমার প্রাণরক্ষা হইবে না।’ প্রথম সে কথায় সে সন্মত হইল না। তাহার পর ষখন দেখিল যে, হাত না কাটিলে তাহার প্রাণ কিছুতেই বাঁচিবে না, তখন সে অগত্যা সন্মত হইল। অজ্ঞান করিয়া কোনোই পর্যন্ত আমি তাহার হাত কাটিয়া ফেলিলাম তাহার পর সেই হাত আমি যথারীতি সুরাপূর্ণ শিশিতে রাখিলাম। পুনরায় জ্ঞান হইবামাত্র চীনে রোগী আপনার কাটা হাত দেখিতে চাহিল। পাছে ভয় পায়, সে জন্ম প্রথম আমি তাহাকে দেখাইতে চাহিলাম না। কিন্তু কাটা হাত দেখিবার জন্ম সে এত কাতর হইল যে, তাহাকে না দেখাইয়া আমি থাকিতে পারিলাম না। হাসপাতালের যে খাটের উপর সে শুইয়া ছিল, শিশিটি আপনার পার্শ্বে তাহার উপর রাখিয়া, বাম হাত দিয়া সে অনেকক্ষণ নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। তাহার পর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস

ফেলিয়া শিশিটি সে চার পাইয়ের নীচে রাখিয়া দিল। সেই দিন হইতে মুহূর্তের নিমিত্ত শিশিটি সে চক্ষুর আড় করিতে দিত না। আর দিনের মধ্যে অনেকবার তাহাকে খাটের উপর তুলিয়া অতি স্নেহের সহিত নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিত। কিছু দিন পরে সে আরোগ্য লাভ করিল। হাসপাতাল হইতে যাইবার পূর্বে আমি তামাশাচ্ছলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—‘ডাক্তারকে বিদায় করিবে না।’

চীনে উত্তর করিল,—‘আমি দুঃখী লোক। আমি আপনাকে কি দিতে পারি?’

আমি বলিলাম,—‘তোমার হাতটি আমাকে প্রদান কর।’

তাহার মুখ বিষন্ন হইল। সে বলিল,—‘মহাশয়! আমাকে ক্ষমা করুন। হাতটি আমি আপনাকে দিতে পারিব না। আমার যখন মৃত্যু হইবে, তখন দেহের সহিত এই হাতটিরও কবর দিতে হইবে। তা না করিলে পরলোকে আমাকে ঠুঁটো হইয়া বেড়াইতে হইবে। আমি এই হাতটিকে ছুন দিয়া রাখিব। তাহা করিলে পচিয়া যাইবে না। আমার মৃত্যু হইলে আমার আত্মীয় স্বজন ইহাকেও দেহের সহিত গোর দিবেন।’

পুনরায় তামাশাচ্ছলে আমি বলিলাম,—‘লবণ অপেক্ষা আরকে ইহা ভালরূপ থাকিবে। তাহার পর আমার নিকট হাতটি আরও ভাল অবস্থায় থাকিবে। কারণ, এরূপ বস্তু ভালরূপে রাখিবার নিমিত্ত আমার নিকট মশলা আছে। আর কিরূপে রাখিতে হয়, তাহাও আমি জানি। তোমার নিকট থাকিলে হাতটি পচিয়া যাইবে। পচা হাত লইয়া শেষে কি পরলোক যাইবে?’

আমার কথাগুলি লোকটির মনে লাগিল। উৎফুল্ল নয়নে আমার দিকে চাহিয়া সে বলিল,—‘আমার মৃত্যুর পর আমার আত্মীয় স্বজনেরা

আসিয়া হাতটি প্রার্থনা করিলে যদি ইহা ফিরিয়া দিতে আপনি প্রতিজ্ঞা করেন, তাহা হইলে আপনার নিকট রাখিয়া যাইতে পারি।’

আমার কুবুদ্ধি! আমি সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলাম। একবার নহে, লোকটি বার বার আমাকে তিন সত্য করাইল। তাহার পর শিশিটি আমার হাতে দিয়া সে প্রস্থান করিল। অগ্ন্যাগ্ন শিশির সঙ্গে আমি সে শিশিটিও রাখিয়া দিলাম।

আমি যে বাড়িতে বাস করিতাম, তাহা কাষ্ঠনির্মিত ছিল। কিছুদিন পরে আমার বাড়িতে আগুন লাগিল। অগ্ন্যাগ্ন দ্রব্যের মধ্যে, অনেকগুলি শিশিও আমার নষ্ট হইয়া গেল। তাহার মধ্যে চীনেম্যানের হাত-সম্বলিত শিশিটিও ধ্বংস হইয়া গেল। যাহা হউক, চীনের কথা আমি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তাহার হাতের কথা, অথবা আমার প্রতিজ্ঞার কথা,—একবারও আমার মনে উদয় হয় নাই।

পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। একদিন প্রাতঃকালে দুইজন চীনেম্যান আসিয়া আমাকে বলিল,—‘মোঙ্গ নামক যে চীনের হাত আপনি কাটিয়াছিলেন, গত রাত্রিতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। আপনার নিকট হইতে সেই হাতটি লইয়া কবরে দিতে সে বার বার অনুরোধ করিয়াছে। সেই হাতের নিমিত্ত আমরা আপনার নিকট আসিয়াছি।’

আমার মাথায় যেন বাজ পড়িল! হাতটি ফিরিয়া দিতে আমি বার বার তিন সত্য করিয়াছিলাম। সেই সত্য হইতে আজ আমি ভ্রষ্ট হইলাম। কি আর করিব? দৈবক্রমে হাতটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আমি সেই কথা তাহাদিগকে বলিলাম। বিরস বদনে তাহারা চলিয়া গেল।

সেই দিন রাত্রিতে ঘরে শয়ন করিয়া আমি নিদ্রা যাইতেছি। রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। ঘরে অল্প অল্প আলো জ্বলিতেছে।

সহসা কে আমার চুল ধরিয়া শযা হইতে আমাকে তুলিয়া বসাইল ! চকিত হইয়া আমি চাহিয়া দেখিলাম ! দেখিলাম যে, একজন চীনে আমার বিছানার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে । আরও দেখিলাম যে, সে আর কেহ নহে, সে সেই মোঙ্গ,—যাহার হাত আমি কাটিয়াছিলাম । ভয়ে বিহ্বল হইয়া আমি কথা কহিতে চেষ্টা করিলাম । কিন্তু আমার মুগ দিয়া কথা বাহির হইল না । কেবল গৌ গৌ শব্দ বাহির হইতে লাগিল । খাটের এক পার্শ্বে তোমার মামী শয়ন করিয়া ছিলেন । সেই শব্দে তাহারও নিদ্রাভঙ্গ হইল । তিনিও চীনাকে দেখিতে পাইলেন । কিছুক্ষণ আমার খাটের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চীনে কুপিত কটাঞ্চে আমার দিকে চাহিয়া ঘোরতর ভৎসনাসূচক ভঙ্গি করিয়া, তাহার দক্ষিণ হাতের আধখানি অর্থাৎ কেবল বাঙটি আমাকে তুলিয়া দেখাইল । তাহার পর, সে ঘর হইতে সে অদৃশ্য হইয়া গেল । পরে যে ঘরে শিশি থাকে, সেই ঘরে খুট-খাট শব্দ হইতে লাগিল । পরে অবগত হইয়াছি যে, প্রত্যেক শিশি নিরীক্ষণ করিয়া সে আপনার হাতের অনুসন্ধান করে । শিশিতে আপনার হাত দেখিতে না পাইয়া, তাহার পর বাড়ির অন্যান্য ঘর সে পাতি পাতি করিয়া অনুসন্ধান করে । আজ কয় বৎসর ধরিয়া প্রতি রাত্ৰিতে এইরূপ করিতেছে । প্রথমে শযা হইতে সে আমাকে উত্তোলন করে, তাহার পর কুপিত ও ভৎসনাপূর্ণ ভাবে সে আমাকে তাহার হাতের আধখানি দেখায়, তাহার পর শিশি-গুলিকে দেখিয়া বেড়ায়, তাহার পর অন্যান্য ঘর অনুসন্ধান করে । রাত্ৰিকালে সহসা মাথার চুল ধরিয়া তুলিলে আমার বড় কষ্ট হয় । সেই জন্ত মাথাটি আমি নেড়া করিয়াছি । এখন সে হাত ধরিয়া আমাকে উত্তোলন করে । যাহা হউক, তোমার মামী ও আমি এই রোগে আজ কয় বৎসর ভুগিতেছি ! চাকর চাকরানী আমার বাড়িতে তিষ্ঠিতে

পারে না। এখন ষাহারা আছে, রাত্ৰিতে তাহাদের কেহ আমার বাড়িতে থাকে না। এই রোগের জন্ম কর্ম পরিত্যাগ করিয়া আমি দেশে আসিয়াছি। কিন্তু চীনে ভূত আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, এই বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত আমি না করিয়াছি—এমন কাজ নাই। তন্ত্র, মন্ত্র, জড়ি, বড়ি, কবচ, মাছলি, ঝাড়ান, কাড়ান, ভূত নামানো, চণ্ড নামানো, যাহা কিছু আছে, সব করিয়াছি। তাহার পর দেশে আসিয়া চীনের নামে শ্রাদ্ধ করিয়াছি, গয়াতে পিণ্ড দিয়াছি, গরীব দুঃখীকে দান করিয়াছি, এক তীর্থস্থান হইতে অন্য তীর্থস্থানে পলায়ন করিয়া বাস করিয়াছি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। যেখানে যাই না কেন, চীনে ভূত সেইখানেই আমার সঙ্গে সঙ্গে যায়। আর একটি আশ্চর্য কথা এই যে, শিশিগুলি যদি আমি সঙ্গে না লইয়া যাই, তাহা হইলে উপদ্রবের আর পরিসীমা থাকে না। রাত্ৰিতে আমাকে শয্যা হইতে তুলিবার পর যখন সে শিশি দেখিতে না পায়, তখন ঘোরতর কুপিত হইয়া সে আমার ঘরের দ্রব্যাদি ভাঙিতে থাকে, বাড়িতে ইট-পাটকেল বৃষ্টি করিতে থাকে। সে জন্ম যেখানে যাই না কেন, শিশিগুলি আমাকে সঙ্গে রাখিতে হয়। এ যন্ত্রণা আর সহ হয় না। এখন মৃত্যু হইলেই আমি যেন বাঁচি।”

রাধামাধব মাতুলের কথাগুলি শুনিলেন। মাতুলকে নানারূপ আশ্বাস প্রদান করা ব্যতীত তখন তিনি আর কিছু বলিলেন না। তাহার পর রাত্ৰিকালে শয়ন করিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—আমি যদি মামাকে এ দায় হইতে উদ্ধার করিতে পারি, তাহা হইলে আমাকে ভাবিতে হইবে না। কিন্তু এ রোগের ঔষধ কি?

ভূত প্রেত সম্বন্ধে রাধামাধব যে সমুদয় পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন, সে সমুদয় পুস্তকের বিষয় সকল তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহার

স্মরণ হইল যে,—একস্থানে আমি পাঠ করিয়াছি যে, মৃত্যুকালে লোকের মনে যদি কোনরূপ একটা একান্ত বাসনা থাকে, তাহা হইলে সে লোকের আত্মার মুক্তি হয় না। সেই বাসনা পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত অনেকদিন সে পৃথিবীতে ঘুরিয়া বেড়ায়। শ্রাদ্ধ, গয়াতে পিণ্ড অথবা দীনদুঃখী-দিগকে দান, এরূপ লোকের নামে করিলে সেই আকীর্ষ আত্মার উপকার হয়। কিন্তু এ সমুদয় কাজ মাতুল করিয়া কোন ফল পান নাই।

রাধামাধবের পুনরায় স্মরণ হইল,—আর একখানি পুস্তকে পাঠ করিয়াছি যে, ভূতদিগের দৃষ্টিশক্তি প্রথর নহে, তাহাদের বুদ্ধিও তীক্ষ্ণ নহে। তাহাদিগকে অনায়াসে প্রতারণা করিতে পারা যায়।

রাধামাধব স্থির করিলেন,—এই ভূতটাকে ঠকাইতে চেষ্টা করিব।

পরদিন রাধামাধব মাতুলকে বলিলেন,—“এ বিপদ হইতে আপনাকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত আমি একটা উপায় ভাবিয়াছি। যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে কিছু দিন এই স্থানে থাকিয়া চেষ্টা করিয়া দেখি।”

মাতুল সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। যাহারা কলিকাতার হাসপাতালে কাজ করেন, সেইরূপ ডাক্তারের সহিত রাধামাধব একসঙ্গে পড়িয়াছিলেন। তাহাদের নিকট হইতে তিনি একটি মড়ার হাত চাহিয়া লইলেন। হাতটি শিশিতে করিয়া মাতুলের অন্যান্য শিশির সহিত রাখিয়া দিলেন। কি হয়, তাহা দেখিবার নিমিত্ত সে রাত্রি পুনরায় সেই কোচের উপর তিনি শয়ন করিলেন। রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে মাতুলের ঘরে তিনি ভূতের শব্দ পাইলেন। তাহার পর, চীনে ভূত যথারীতি সেই শিশির ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। যথারীতি একে একে সমুদয় শিশিগুলি সে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল। যে শিশির ভিতর রাধামাধব সেই হাত রাখিয়াছিলেন, ভূত আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। শিশির ভিতর হাত দেখিয়া আনন্দে তাহার

মুখ প্রফুল্ল হইল। শিশিটি সে বাম হাতে তুলিয়া দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ দেখিয়া রাগে তাহার মুখ রক্তবর্ণ হইল। রাগে সে শিশি দূরে ভূমির উপর নিক্ষেপ করিল। শিশিটি ভাঙ্গিয়া গেল। ভূত অদৃশ্য হইল।

রাধামাধবের চেষ্টা বিফল হইল। ভূত প্রতারিত হইল না। কেন এরূপ হইল, রাধামাধব তাহা ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে তিনি স্থির করিলেন যে, বাঙালী অথবা হিন্দুস্থানীর হস্ত দ্বারা ভূতকে ভূলাইতে পারা যাইবে না। আসল চীনেম্যানের হাত চাট। কিন্তু হাসপাতালে চীনেম্যানের হাত সহজে পাওয়া যায় না। তথাপি রাধামাধব নিরাশ হইলেন না। এইরূপ একটি হাতের জন্ত বন্ধুদিগকে তিনি বলিয়া রাখিলেন। দৈবক্রমে এই সময় এক জন চীনে স্ত্রীর ভেতালার ভার হইতে পড়িয়া গিয়াছিল। সে একবারে মরে নুই। তাহার একটি হাত চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সেই হাতটি ছেদন করা হইল। রাধামাধব সেই হাতটি পাইলেন। পূর্বের মত হাতটি শিশিতে রাখিয়া পুনরায় তিনি কোচের উপর শয়ন করিয়া রহিলেন। রাত্রি দুই প্রহরের পর ভূত যথারীতি উপস্থিত হইয়া শিশিগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল। হস্তসঙ্কলিত শিশি দেখিয়া আজও প্রথম তাহার মনে আনন্দ হইল। কিন্তু আজও সে পূর্বের ন্যায় কুপিত হইয়া শিশিটি আছড়াইয়া ফেলিয়া দিল। শিশিটি ভাঙ্গিয়া গেল।

রাধামাধবের চেষ্টা এবারও বিফল হইল। পরদিন প্রাতঃকালে মাতুল ও তিনি হাতটি ভূমি হইতে তুলিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ দেখিয়া মাতুল বলিলেন,—“ওঃ, বুঝিয়াছি! এটা বাম হাত। চীনে ভূতের দক্ষিণ হাত গিয়াছে। বামহাত দেখিয়া সে জানিতে পারিয়াছে যে, এটা জাল হাত, তাহার নিজের হাত নহে। সেই জন্ত সে রাগ করিয়া ফেলিয়া গিয়াছে।”

রাধামাধব বুঝিলেন যে, ইহাই প্রকৃত কারণ বটে। সেই দিন হইতে চীনেম্যানের দক্ষিণ হাতের জগ্ৰ তিনি সন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু এক মাস গত হইয়া গেল। তথাপি এরূপ হাতের তিনি যোগাড় করিতে পারিলেন না। রোগে মৃত ব্যক্তির হাত হইলে চলিবে কি না, সেরূপ একটা সন্দেহ মাতুল ও ভাগিনেয়ের মনে উপস্থিত হইল। এমন সময় চীনের লড়াই আরম্ভ হইল। কলিকাতা হইতে যে সমুদয় জাহাজ চীনদেশে গমন করে, সেইরূপ জাহাজের এক জন খুলাসির সহিত রাধামাধব খালাপ করিয়া তাহাকে বলিলেন,—“আরকপূর্ণ একটি শিশি তোমাকে দিতেছি। অঙ্গাঘাতে হত হইয়াছে, এরূপ চীনে পুরুষ মানুষের দক্ষিণ হাত যদি তুমি এই শিশির ভিতর করিয়া আনিয়া দিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে আমি একশত টাকা পুরস্কার দিব।”

খালাসি সম্মত হইল। অঙ্গাঘাতে সে সময় অনেক চীনে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। স্বতরাং এরূপ একটি হাতের যোগাড় করিতে খালাসিকে অধিক কষ্ট পাউতে হয় নাই। দুই মাস পরে সেই আরকপূর্ণ শিশি করিয়া এক জন চীনেম্যানের দক্ষিণ হস্ত সে রাধামাধবকে আনিয়া দিল।

শিশিটি রাধামাধব অন্যান্য শিশির সহিত রাখিয়া পূর্বের গ্যায় সেই ঘরে শয়ন করিয়া রাখিলেন। পূর্বের গ্যায় যথাসময়ে ভূত আসিয়া একে একে শিশিগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল। পূর্বের গ্যায় আজও সে হস্তসম্বলিত শিশিটি হাতে লইয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল; কিন্তু আজ তাহার মুখে ক্রোধের লক্ষণ উদয় হইল না; আজ সে ক্রোধে শিশিটি আছড়াইয়া ফেলিল না। আনন্দের উপর আনন্দে আজ তাহার মুখশ্রী প্রফুল্ল হইতে প্রফুল্লতর হইতে লাগিল। অবশেষে শিশিটি হাতে লইয়া আনন্দে সে ঘরের ভিতর দুপ দাপ, ধূপ দাপ নৃত্য করিতে লাগিল। নাচিতে নাচিতে সে “ফিং ফাং ফৌ, পিং পাং পৌ,” বলিয়া গান করিতে

লাগিল। নাচিতে নাচিতে গান গাহিতে গাহিতে শিশিটি হাতে করিয়া ঘর হইতে সে অদৃশ্য হইয়া পড়িল। রাধামাধব তাড়াতাড়ি মাতুলকে ডাকিয়া এই স্মসমাচার প্রদান করিলেন। কিন্তু চীনে ভূত তখনও বাটী হইতে যায় নাই। মাঝের একটি ঘরে তখন সে এক প্রকার চপর চপর শব্দ করিতেছিল। মাতুল, মাতুলানী ও রাধামাধব সেই ঘরের দ্বারের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। সে ঘরে আলো জ্বলিতেছিল। দ্বারের ফাঁক দিয়া সকলে দেখিলেন যে, ঘরের মাঝখানে বসিয়া চীনে ভূত—খালা ও অনেকগুলি বাটি হইতে কি সব আহাৰ করিতেছে। মাতুলানী তখন হাসিয়া বলিলেন,—“আজ পৌষ মাসের সংক্রান্তি। আজ আমি নানারূপ পিষ্টক প্রস্তুত করিয়াছিলাম। তাই মনে করিলাম যে—আহা! এই চীনে ভূতটি প্রতিদিন আমাদের বাটীতে আসে; তাহাকে কিছু দিব না! তাই খালা ও বাটিতে নানারূপ পিঠে ও পরমান্ন তাহার জন্ম সাজাইয়া রাখিয়াছিলাম। তাই সে গাইতেছে।”

পিষ্টকাদি আহাৰ করিয়া চীনে ভূত পরম পরিতোষ লাভ করিল। তাহার পর সে চলিয়া গেল।

সেই দিন হইতে মাতুলের বাটীতে আর সে চীনে ভূতের উপদ্রব হয় নাই। মাতুল ও মাতুলানীর শরীর ও মন সুস্থ হইল। সেই দিন হইতে পরম সুখে তাঁহারা দিন যাপন করিতে লাগিলেন। মাতুল এখন মাথায় চুল রাখিয়াছেন রাধামাধবকে তিনি বলেন,—“তোমার বুদ্ধিবলে আমরা এই নিদারুণ যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছি। তুমি আমাদের প্রাণ রক্ষা করিয়াছ। আর তোমার ডাক্তারি করিতে হইবে না। সপরিবারে তুমি আমার বাটীতে আসিয়া বাস কর। আমি যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়াছি। টাকার জন্ম তোমাকে আর ভাবিতে হইবে না।”

রাধামাধব এখন মাতুলের গৃহে বাস করিতেছেন।

যথ

আজ যে যথের গল্পটি তোমাকে বলব, সে গল্প আমি শুনেছি পরের মুখে ; আর এ গল্পটির ভিতর আর যাই থাক, পিলে-চমকখন ভয় নাই ।

আমি নিজে পথিমধ্যে একবার একটি যথ দেখেছিলুম—কোথায় কখন, কি অবস্থায়, তার ইতিবৃত্ত একটি গল্প আকারে প্রকাশ করেছি । সেই যথ দেখে এতটা ভয় পাই যে যখন বাড়ি গিয়ে উঠলুম, তখন আমার দেহের উত্তাপ ১০৪° ডিগ্রীতে উঠে গিয়েছে । একে জ্যৈষ্ঠ মাস, আকাশে হচ্ছে অগ্নিবৃষ্টি তার উপর ম্যালেরিয়ার দেশ, তার উপর মনের উপর বিভীষিকার প্রচণ্ড দাক্ষ্য এই সব মিলে আমার নাড়িকে যে ঘোড় দৌড় করাবে, তাতে আশ্চর্য কি ?—বাড়ি গিয়েই বিছানা নিলুম, আর সাতদিন সেখান থেকে নড়িনি । আমার চিকিৎসার ভার নিলেন জনৈক পাড়ার্গেয়ে কবিরাজ । তাঁর ওষুধ হল দুটি—লঙ্ঘন আর পাচন । সে পাচন যেমন সবুজ তেমনি তিতো । লঙ্ঘনের চোটে ক্ষিদেয় পেট চোঁ চোঁ করত ; তাই সেই পাচন ওষুধ হিসেবে নয়, রোগীর পথ্য হিসেবে গলাধঃকরণ করতুম । আমার বিছানার পাশে সমস্ত দিন হাজির থাকতেন রমা ঠাকুর । আর এই শয্যাশায়ী অবস্থায় তাঁর মুখে, এ গল্প শুনেছি ।

আগে দু'কথায় রমাঠাকুরের পরিচয় দিই ; কারণ তিনি ছিলেন যেমন গরিব, তেমনি ভাল লোক । তাঁর পুরো নাম রমাকান্ত নিয়োগী ঠাকুর । এঁরই পূর্বপুরুষরা পূর্বে আমাদের গ্রামের মালিক ছিলেন । পরে নিয়োগী বংশ ধনেপ্রাণে ধ্বংস হয় । শেষটায় এঁদের মধ্যে অবশিষ্ট রইলেন

একমাত্র রমাঠাকুর। তিনি একা বাস করতেন একখানি খড়ো ঘরে। কখনও বিবাহ করেননি, ফলে তাঁর ঘরে আর দ্বিতীয় লোক ছিলনা। তিনি অবশেষে হয়েছিলেন আমাদের কুল দেবতার পূজারী। আমাদের কুলদেবতা 'শ্যামসুন্দর' ছিলেন জঙ্গম ঠাকুর—কোন শরিকের বাড়ি পীলাক্রমে থাকতেন দুদিন, কোন বাড়িতে বা তিন দিন। ঠাকুরের ভোগ খেয়ে ও দক্ষিণা নিয়েই তাঁর অন্ন বস্ত্রের সংস্থান হত; আর উপরি সময় তিনি পাঁচ জনের শুশ্রূষা করতেন। লোকটি আকারে ছোটখাট; তাঁর বর্ণ শ্যাম, আর মাথার চুল একদম সাদা। এমন নিরীহ, মিষ্টভাষী ও পরোপকারী লোক হাজারে একটি দেখা যায় না। তাঁর নিজের কোনও কাজ ছিল না, কিন্তু পরের অনেক ফাইফরমাস খেটে তিনি হাঁপ জিরবার সময় পেতেন না।

আমি বিচ্যানায়ে শুয়ে শুয়ে রমাঠাকুরকে আমার যথ দর্শনের গল্প বললুম। তিনি সে গল্প শুনে আমাকে ভরসা দিলেন যে কিছু ভয় নেই, তুমি দুদিনেই ভাল হয়ে উঠবে; যথ তোমার আমার মত লোকের হস্তারক নয়। তবে আমার গল্প তিনি সত্য বলেই মেনে নিলেন; কেননা রমাঠাকুরও একবার দিনদুপুরে নয়, রাতদুপুরে যথ দেখেছিলেন। আর তিনি যে জলজ্যান্ত যথ দেখেছিলেন, সে বিষয় তাঁর মনে কোন সন্দেহ ছিল না। তিনি ইংরেজি পড়েননি, স্মতরাং যা দেখতেন যা শুনতেন তাতেই বিশ্বাস করতেন। আমার কথা আলাদা। আমি ইংরেজি পড়েছি, স্মতরাং যা দেখি শুনি তাতে বিশ্বাস করিনে। আমার থেকে থেকেই মনে হত যে, আমি যথ টখ কিছুই দেখিনি। পান্নির ভিতর হয়ত ঘুমিয়ে পড়ে দুঃস্বপ্ন দেখেছিলুম। ওষুধই যে শুধু স্বপ্নলব্ধ হয় তা নয়; কখনও কখনও স্বপ্নলব্ধ গল্প কবিতাও পাওয়া যায়। তা যে হয়, তা ইংরেজি সাহিত্যের

ইতিহাস পড়লেই জানতে পাবে। এখন নিয়োগী ঠাকুরের গল্প শোন। শুনতে কিছু কষ্ট হবেনা, কেন না গল্পটি এত ছোট্ট যে, একটি ছোট এলাচের খোসার ভিতর তাকে পোরা যায়। রমাঠাকুর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, নন্দীগ্রাম কোথায় জানেন? আমি বললুম, না।

তিনি বললেন—তা জানবেন কি করে? আপুনি দু-পাচ বছরে একবার বাড়ি আসেন, আর দু'পাচদিন থেকেই চলে যান। নন্দীগ্রাম এখান থেকে দু-পা। এই দক্ষিণের ঝিলটে পেরিয়ে তারপর মাঠটার ওপারে বায়ে ভেঙে যে পথটা পাওয়া যায়, সেই পথটায় কিছুদূর গেলেই নন্দীগ্রামে পৌঁছান যায়। এখান থেকে মাত্র পাচ ক্রোশ রাস্তা।

বছর তিনেক আগে আমার একবার নন্দীগ্রামে যাবার দরকার ছিল। দরকার আর কিছুই নয়—সেখানে গেলে খালি হাতে আর ফিরতে হত না। সে গ্রামের অধিকারী বাবুরা দেবদ্বিজ্ঞে অভ্যন্ত ভক্তি করতেন, যদিচ তাঁরাও ছিলেন ব্রাহ্মণ। তাঁদের দ্বারস্থ হলে টাকাটা সিকেটা মিলত।

আমি স্থির করলুম, কোজাগর পূণিয়ার রাতে বেরিয়ে পড়ব। সেদিন ত সিদ্ধি খেতেই হয়, আর সমস্ত রাত জাগতেও হয়। তাই মনে করলুম যে ঘরে বসে রাত জাগার চাইতে এক ঘটি সিদ্ধি খেয়ে রাত্তিরেই পড়ব বেরিয়ে—আর হেসে খেলে পাঁচ ক্রোশ পথ চলে যাব। রাত এগারটায় বেরলেও ভোর হতে না হতে নন্দীগ্রামে পৌঁছব।

আমি জিজ্ঞেস করলুম—“রাত্তিরে একা এই বনজঙ্গলের ভিতর দিয়ে যেতে ভয় করল না?” তিনি হেসে উত্তর করলেন “ভয় কিসের, চোর ডাকাতির? জানেন না, লেংটার নেই বাটপাড়ের ভয়? চোর ডাকাত আমার নেবে কি? গলার তুলসী কাঠের মালা, না

গায়ের নামাবলী? তা ছাড়া এ অঞ্চলে যারা ডাকাতি করে, তারা সব আপনাদেরই মাইনে করা লেঠেল। তারা আমাকে ছোঁবে না, সঙ্গে হীরা-জহরৎ থাকলেও নয়। ভয় অবশ্য বাঘের আছে, কিন্তু তারাও আমাদের মত গরিব ব্রাহ্মণদের ছোঁয় না। আমাদের শরীরে আছে হাড় আর চামড়া আর দু-তিন ছটাক রক্ত, কিন্তু রস একবারেই নেই। বাঘরাও মানুষ চেনে, অর্থাৎ কে খাওয়া আর কে অখাওয়া। সে যাই হোক, রাত এগারটা আন্দাজ বেরিয়ে পড়লুম। আর ঘণ্টাগানেরকের মতোই খঞ্জনার ধারে গিয়ে পড়লুম। খঞ্জনা কখনও দেখেছেন? চমৎকার নদী। রশি দু'তিনের চাইতে বেশি চওড়া নয়—কিন্তু বারো মাস তাতে জল থাকে, আর সে জল বারো মাস টলটল করে, তক্ তক্ করে। এই খঞ্জনার ধার দিয়েই সোজা নন্দীগ্রামে যেতে হয়।

কোজাগর পূর্ণিমার রাত, চাঁদের আলোয় গাছ পালা সব হাসছে, আর আলোকলতায় ছাওয়া কুলের গাছগুলো দেখতে মনে হচ্ছে যেন সব সোনার তারে জড়ান। আমি মহা স্মৃতি করে চলেছি, ক্রমে পাল পাড়ার সমুখে গিয়ে উঠলুম। পালপাড়া বলে এখন কোনও গ্রাম নেই, কিন্তু তার নাম আছে। সমস্ত গ্রাম বনজঙ্গলে গ্রাস করেছে। শুধু এ গ্রামের সেকালের ধনকুবের সনাতন পালের আধক্রোশজোড়া ভাঙ্গা বাড়ি পালদের উড়ে যাওয়া টাকার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

এমন সময় নদীর মধ্যে থেকে একটি গানের সুর আমার কানে এল। গানের সুর বোধ হয় ভাটিয়ালি। বাঁশীর মত মিষ্টি তার আওয়াজ। সে গান শোনবামাত্র মন উদাস হয়ে যায়, আর চোখে আপনা হতেই জল আসে। জীবনের যত আক্ষেপ যেন সে গানের মধ্যে আছে।

একটু পরে দেখি—পাঁচটি তামার ঘড়া উজান বেয়ে ভেসে আসছে।

আর তার উপরে একটি ছেলে ঝাড়াসন হয়ে বসে গান করছে। সে যেন সাক্ষাৎ দেব-পুত্র। ধবধবে তার রঙ, কুঁদে কাটা তার মুখ, ঝায়ে তার সোনার মল, হাতে সোনার বালা ও বাজু, গলায় সাতনলী হার। বৃকে ঝুলছে সোনার পৈতে। পরনে রক্তের মত লাল চেলি, কপালে রক্ত চন্দনের ফোঁটা। একটু লক্ষ্য করে দেখলুম, যা তার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তা সোনার অলঙ্কার নয়—সোনার সাপ। ঝার সেই দেব-বালকের কোলে রয়েছে একটি ছোট ছেলের কঙ্কাল। তখন বুঝলুম, এটি হচ্ছে একটি যথ। আর মনে পড়ল ছেলেবেলায় শুনেছিলুম যে, পরম বৈষ্ণব সনাতন পাল একটি ব্রাহ্মণের ছেলেকে যথ দিয়েছিলেন সে তাঁর ধন রক্ষা করেছিল কিন্তু তাঁর বংশ নির্বংশ করেছিল।

আমি সনাতন পালের পোড়ো-বাড়ির স্রমুখে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে এই দিব্য-মূর্তি দেখছিলুম আর একমনে এই পাগল-করা গান শুনেছিলুম। হঠাৎ কোথেকে কষ্টিপাথরের মত কালো একটুকরো মেঘ এসে চাঁদের মুখ ঢেকে দিলে। অমনি চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। এই ঘোর অন্ধকারে সেই সব তামার ঘড়া আর সেই দেব-বালক অদৃশ্য হয়ে গেল—আর তার গানের সুরও আন্তে আন্তে আকাশে মিলিয়ে গেল। অমনি সেই মেঘও কেটে গেল, আর দিনের আলোর মত ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় গাছপালা সব আবার হেসে উঠল।

তখন দেখি, আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলুম সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছি। আমার সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছে, যেন আমার রক্তমাংসের শরীর পাষণ হয়ে গিয়েছে।

খানিকক্ষণ পরে আমার দেহ-মন ফিরে এল, আর নিশিতে পাওয়া লোক যে ভাবে হাঁটে সেইভাবে হাঁটতে হাঁটতে সূর্য ওঠবার আগে নন্দীগ্রামে গিয়ে পৌঁছলুম।

কিন্তু এই যথ দেখার কথা কাউকেও মিলিনি। কারণ একথা মুখে মুখে প্রচার হলে, হাজার লোক খঞ্জনায় নেমে পড়বে। এই তামার ঘড়ার তল্লাসে। অবশ্যই তাতে সব ঘড়া ডুবুরীরা উপরে তুলতে পারত না—মধ্যে থেকে তারা খঞ্জনার ফটিক জল শুধু ঘুলিয়ে দিত। আর যদি তারা সেই মোহর-ভরা ঘড়া তুলতেই পারত, তাহলে আরও সর্বনাশ হত। কারণ এই সব ঘড়ায় পোরা প্রতি মোহরটি সোনার সাপ হয়ে গিয়েছিল। সে সাপ যথের গায়ের গহনা। কিন্তু মানুষে ছোঁবামাত্র মারা যায়।

রমা ঠাকুরের গল্পও শেষ হল, আর পিসিমা এক বাটা পাচন নিয়ে এসে হাজির হলেন। এ গল্প যেমন শুনেছি তেমন নিখছি। আশা করি এই পাড়াগেয়ে গল্প তোমাদের কাছে পাড়াগেয়ে কবিরাজি পাচনের মত বিশ্বাস লাগবে না।

গৌরীপ্রসাদ বসু সম্পাদিত অন্যান্য সঙ্কলন-গ্রন্থ

হাসির গল্পের সঙ্কলন

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, ত্রৈলোক্যনাথ, প্রভাতকুমার, শরৎচন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ, গণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সুকুমার রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজ্ঞানন্দ, শিবরাম, বুদ্ধদেব বসু, প্রবোধ সাংঘাল, অচিন্ত্যকুমার, সর্বোজ রায়চৌধুরী, শীলা মজুমদার, রবীন্দ্রলাল রায়, সুনির্মল বসু, মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়,

গৌরীপ্রসাদ বসু প্রভৃতির বাইশটি অপূর্ণ হাসির গল্পের সঙ্কলন।

৪

সচিত্র সংস্করণ

মূল্য দুই টাকা মাত্র

ডিটেকটিভ গল্পের সঙ্কলন

একযুগ আগেকার গোয়েন্দা-কাহিনীর সঙ্কলনিত। শরৎচন্দ্র সরকারের 'দিনে-ডাকাতি', বাংলায় প্রথম শ্রেণীর গোয়েন্দা কাহিনীর প্রথম লেখক পাঁচকড়ি দে মহাশয়ের 'চিঠিচুরি', গোয়েন্দা-কাহিনীর স্বনামধন্য লেখক দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'জাল-ডিটেকটিভ', প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের 'সংসার কাথের অভিজ্ঞতার কাহিনী 'কৃত্রিম-মুদ্রা' প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট গল্প এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। আড়াইশ পৃষ্ঠার উপর বিরাট গ্রন্থের অন্যান্য লেখকদের মধ্যে রহিয়াছেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, হেমেন্দ্রকুমার রায়, শরৎচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, আশালতা সিংহ, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি। ইহা ছাড়া এই গ্রন্থে রহিয়াছে গোয়েন্দা-কাহিনীর ভিত্তিতে লিখিত শরৎচন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী প্রমুখের বিশিষ্ট রসরচনা।

সচিত্র সংস্করণ

মূল্য আড়াই টাকা মাত্র

